অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

শিল্পায়ন

শিল্পায়ণ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পায়ন



সিগনেট প্রেস কলকাতা ২০

প্রথম সংস্করণ

চৈত্র ১৩৬১

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগনেট প্রেস

১০|২ এলগিন রোড

কলকাতা ২০

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

সহায়তা করেছেন

পীযূষ মিত্র

মুদ্রক

প্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ

৫ চিন্তামণি দাস লেন

প্রচ্ছদপট মুদ্রক

গসেন এন্ড কোম্পানি

৭|১ গ্রান্ট লেন

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইন্ডিং ওয়ার্কস

৬১|১ মির্জাপুর স্ট্রিট

দাম দুটাকা

. . . .

শিল্পায়ণের গোড়ার কথা

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এক হেমন্তের সন্ধ্যায় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একবার এসে হাজির হয়েছিলেন এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাইন আর্ট্স্ বিভাগ খোলা হচ্ছে তখন; তার বিলি ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ। আশুতোষের ইচ্ছা অবনীন্দ্রনাথকে তার কর্ণধার করেন।

অবনীন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের চাকরি ছেড়েছেন, ঝগড়া করেই ছেড়ে দিয়েছেন, প্রায় বছর ছয়েক হল। বাড়িতে বসে দিব্যি ঝাড়া-হাত-পা হয়ে মনের আনন্দে ছবি আঁকছেন, পড়াশুনা করছেন, বেশ আছেন—তিনি কি স্বইচ্ছায় চাকরির ফাঁদে আবার পা গলান? তাই আশুতোষের প্রতিনিধিরূপে যাঁরাই অবনীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সকলকেই তিনি হাঁকিয়ে দিয়েছেন, শ্রীদিনেশচন্দ্র সেনকে সুদ্ধ। এইবার স্বয়ং আশুতোষের পালা।

ঘটনাটা হয়েছিল ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশুতোষের কি কথাবার্তা হয়েছিল তা আমি শুনিনি, আমরা তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ, বড় বড় অতিথি বাড়িতে এলেই আমাদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হত—পাছে গোলমাল করি বলে। পরে কিন্তু যা শুনেছিলুম, তা হচ্ছে এই। দাদামশাইও চাকরির বাঁধনে ধরা দেবেন না, আশুতোষও ছাড়বেন না। আশুতোষ বলেছিলেন—অবনীবাবু, বছরে আপনি ছটি বক্তৃতা দেবেন, আমরা সকলে শুনে ধন্য হব, একে কি চাকরি বলে? দাদামশাই নাকি বলেছিলেন—ঐ যে মাস-মাইনে, ঐটেতেই তো ভয়! আশুতোষ বলেছিলেন—মাইনে কোথায়, ও তো অর্ঘ্য। বিশ্ববিদ্যালয় আপনার পায়ে পেঁছে দিচ্ছে পুজোর সামগ্রী।

আশুতোষের সঙ্গে কথায় অবনীন্দ্রনাথ পারেননি; আশুতোষের ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে, সরলতায়, অকপটতায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর আর 'না' বলবার উপায় ছিল না। এইভাবে অবনীন্দ্রনাথ হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাগেশ্বরী অধ্যাপক।

সংস্কৃত সাহিত্যে এবং ইংরেজী সাহিত্যে শিল্পশাস্ত্র নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বহু বর্ষ ধরেই পড়াশুনা, গবেষণা করছিলেন। প্রায় সাত আট বছর পূর্বে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে, অবনীন্দ্রনাথের লেখা গুটিকয়েক শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ—তন্মধ্যে নাম করা যেতে পারে 'ভারত ষড়ঙ্গ' ও 'ষড়ঙ্গ দর্শন' তখনকার সাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হবার পর বাঙলার শিল্পরসিকেরা অবনীন্দ্রনাথকে শুধু শিল্পী নয়, শিল্পজ্ঞানী বলে চিনতে শিখেছিলেন। এই সময়েই বোধ করি নন্দলাল বসু মহাশয় অসিত হালদার মহাশয়কে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন— "অবনীবাবু অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন বলিয়া বোধ হইতেছে... তিনি শিল্প সম্বন্ধে একটি চমৎকার পুস্তক লিখচেন। আমাদের জন্য বজ্রের মত অচ্ছেদ্য বর্ম নির্মাণ করিতেছেন।" আশুতোষও এ খবর রাখতেন। তারপর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথের ইংরেজী 'ষড়ঙ্গ' গ্রন্থাকারে বার হল। ততদিনে লোকে তাঁকে শিল্পশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ বলে মানতে শুরু করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বল্প-আলোকিত ঘরে উঁচু তক্তার উপর দাঁড়িয়ে সবুজ-ঢাকা একটি টেবিল-আলোর তলায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বাগেশ্বরী বক্তৃতার প্রবন্ধগুলি পড়ে যেতেন। সারি সারি বেঞ্চিতে ছাত্রেরা, শ্রোতারা এবং তাদের সঙ্গে একাসনে বসে সার্ আশুতোষ, অর্ধেন্দ্রকুমার প্রভৃতি বিদ্বজ্জন বক্তৃতা শুনতেন। আমরা বড় হয়ে যখন দাদামশায়ের বক্তৃতা শুনতে গেছি তখনও ঐ একই দৃশ্য দেখেছি।

প্রথমে পাঁচ বছরের কড়ারে ১৯২১ থেকে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথকে বাগেশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়, তারপর আরো তিন বছর (১৯২৬-১৯২৯) তার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি খান ত্রিশেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এর একটি প্রবন্ধ 'প্রবর্তকে' একটি 'প্রবাসীতে' এবং বাকি সবগুলি নিয়মিত 'বঙ্গবাণীতে' প্রকাশিত হয়েছিল।

অবনীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ত্যাগ করবার পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রস্তাব হয় বাগেশ্বরী বক্তৃতাগুলি একত্র করে গ্রন্থাকারে বার করবার। সেটা ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ। অবনীন্দ্রনাথ সেই সময় তাঁর প্রকাশিত লেখাগুলি একত্র করে সাজাতে গোছাতে আরম্ভ করেন—এই হচ্ছে 'শিল্পায়ণ'-এর পত্তন। মূল বাগেশ্বরী বক্তৃতাগুলিকে কেন কেটে-ছেঁটে পুনর্লিখিত রূপে খাড়া করবার প্রয়োজন হয়েছিল তার কৈফিয়ৎ অবনীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছেন তাঁর ভূমিকায়—"যাত্রীতে যাত্রীতে পথ চলতে-চলতে

কথার মতো করে গাঁথা হয়েছিল এই সমস্ত প্রবন্ধ... যেমন খুশি, যা খুশি বলে যাওয়া চলে সহযাত্রীদের মধ্যে বলেই যে সেগুলো সেই ভাবেই পাঠক-দের সামনে বই ছাপিয়ে প্রকাশ করতে হবে তার কোনো কারণ দেখিনে।"

শিল্পায়ণের প্রথম খণ্ডটি অবনীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ করে বসেছিলেন তার ছাপার কাজ আরম্ভ হওয়ার অপেক্ষায়। প্রথম খণ্ডটি ছাপা শুরু হলেই দ্বিতীয় বা শেষ খণ্ডে হাত দেবেন এমনি ইচ্ছা ছিল। দুঃখের বিষয়, বহু বছর ধরেই শিল্পায়ণ ছাপার কোনো আয়োজন হল না; এবং শেষে বহুদিন পরে যখন অবনীন্দ্রনাথকে শিল্পায়ণ সম্পূর্ণ করবার অনুরোধ করা হল, তখন তাঁর ও-কাজের উৎসাহ লোপ পেয়েছে।

শিল্পায়ণের দ্বিতীয় খণ্ড লেখা হল না। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে মূল বাগেশ্বরী বক্তৃতাগুলি একত্র করে একটি বই প্রকাশিত হল। এই বইটির কি নাম দেওয়া হবে, এই প্রশ্ন করে বিশ্ববিদ্যালয় দাদা-মশাইকে চিঠি লেখেন। দাদামশাই একটি চিরকুটে 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' এই কথাটি লিখে আমার হাতে পাঠিয়ে দেন। ঐ নামে যে বই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল কয়েক বছরের মধ্যেই তা নিঃশেষিত হয়ে যায়। তার আর পুনর্মুদ্রণ হয়নি।

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীর প্রবন্ধগুলির একটি নিজস্ব মূল্য আছে। সেখানে অবনীন্দ্রনাথ মজলিসি ভাষায় কথা বলেছেন, বল্গা ছেড়ে ছুটিয়েছেন কথার স্রোত—যাতে করে ভারী ভারী, শক্ত শক্ত বিষয়গুলি প্রজাপতির মতো ফুরফুর করে ঘুরে বেড়িয়েছে আমাদের সামনে। এসেছে গেছে বার-বার একই প্রজাপতি রঙিন পাখনা মেলে। এতে করে, এক-একটি প্রবন্ধ পৃথক ভাবে পড়ে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু সমস্ত বইখানি একসঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে পড়তে গেলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার সম্ভাবনা।

'শিল্পায়ণ' বইখানি তাই রচিত হল মালাগাঁথার ছন্দে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধকে এক একটি গন্ধ-পুষ্পের আকারে রচনা করে এক সূত্রে গাঁথা হয়েছে এই প্রথম খণ্ডটি। প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ পড়ে যেতে-যেতে একটি সমগ্রতার ছবি ফুটে ওঠে, ধৈর্যভঙ্গ হবার সম্ভাবনাও বোধকরি নেই।

এতদিন পরে সিগনেট প্রেস কালের কবলে চাপা পড়া এই উপাদেয় গ্রন্থটি প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়ে আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন, আশা করি দেশবাসী আমার সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত হবেন।

১ অগাস্ট ১৯৫৪ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ভূমিকা

১৩২৮ ফাল্গুন—১৩৩৩ আশ্বিন পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত আমার এই বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী যা বঙ্গবাণী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেছিলাম সেগুলি একত্রে 'শিল্পায়ণ' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে অনুরুদ্ধ হয়েছি অনেকবার, কিন্তু মনে সাহস পাইনি, কেননা যাত্রীতে-যাত্রীতে পথ চলতে-চলতে কথার মতো করে গাঁথা হয়েছিল এই সমস্ত প্রবন্ধ, কাজেই স্বভাবত কথাচ্ছলে বলায় যা হয়ে থাকে—নানা অবান্তর কথা এবং একই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলায় অনর্থক ভারগ্রস্ত ও দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল অনেকগুলো প্রসঙ্গ, তাতে করে প্রবন্ধ এক-একটা পড়বার সময় আমারই ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে, পাঠকদের তো হবেই। যেমন খুশি, যা খুশি বলে যাওয়া চলে সহযাত্রীদের মধ্যে বলেই যে সেগুলো সেই ভাবেই পাঠকদের সামনে বই ছাপিয়ে প্রকাশ করতে হবে তার কোনো কারণ দেখিনে। সুতরাং কিছু অদল-বদল করতে হল পুরাতন লেখার মধ্যে, নতুন চিন্তাও কিছু-কিছু আমার দুর্বল অবস্থায় পরিশ্রম স্বীকার করেও যোজনা করে দিতে হয়েছে।

পণ্ডিতেরা বলেন 'নালমতিবিস্তরেণ' অমৃত হয় এক ফোঁটা রস দেয় অনেক, এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশের কালে সেই উপদেশ মেনে কাঁচি নির্ভয়ে চালিয়েছি, আসলটুকু যাতে নষ্ট না হয় এই ভাবে সংক্ষেপ করেছি বক্তব্য। আশা করি এতে বইখানি সুখপাঠ্য হবে। নিজের শিল্প নিয়ে দেশের লোকের কাছে প্রশংসার চেয়ে অপ্রশংসার মাত্রা অধিক পড়েছে আমার ভাগ্যে। এই বই পড়ে আমার শিল্পবুদ্ধির যে কেউ সেই ভাবের সমালোচনা করতে ক্ষান্ত থাকবে তা নয়, সুবিধা এই যে আমি পূর্ব হতে জানছি সমালোচনা হবে, কাদের দ্বারা তাও জানছি, সুতরাং স্বপক্ষ সমর্থন করতে আমি একটুও চেষ্টা না করে সেই অল্পসংখ্যক পাঠক যাঁরা জানতে চান শিল্পকে, তাঁদের দরবারে পেশ করছি এই সমস্ত চিন্তা যা বহুকাল আগে বলা-কওয়ার মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করেছিল। কিমধিকমিতি—

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পায়ণ

.....১.....

Art is not a pleasure trip, it is a battle—Millet

আমাদের দেশের সাধকের বাণী—'ধীরে ধীরে পগ ধরো মুসাফির, সিঁড়ি হৈ অধবনী'—ধীরে-ধীরে পা ধরো যাত্রীগণ দুর্গম সোপান! অনলস সাধনা শিল্পীর সাধনা 'অলসস্য কুতোসিম্পং অসিম্পস্যকুতোধনং?' বৈদিক ঋষি-গণ বলে গেছেন—'শিল্পশাস্ত্র সমূহের দ্বারায় যজমান নিজের আত্মাকে ছন্দোময় করিয়া যথার্থ যে সংস্কৃতি তাই লাভ করেন এবং প্রাণের সহিত বাক্যকে, চক্ষুর সহিত মনকে, শ্রোত্রের সহিত আত্মাকে মিলিত করেন!'

এই শিল্পকে অধিকার করা মানে মানুষের মধ্যে যে সব শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাদের দখলে আনা। একাধারে রূপকার ও রসরচনাকারের কৃতিত্বকে লাভ করা!

যতদিন মানুষ জানেনি তার নিজের মধ্যেকার চমৎকারী শিল্পশক্তিকে ততদিন বিরাট সৃষ্টির মধ্যে বর্তে থাকা সুসাধ্য হয়নি তার পক্ষে, আপনার অজ্ঞতা ও অক্ষমতা দুর্ভেদ্য আবরণের মতো মানুষকে ঘিরেই ছিল—অপার জল তাকে পার দিতে চায় না, দুরারোহ পর্বত সকল, দুর্গম অরণ্যানী চলার পথে বিরাট বাধা হয়ে বসেই থাকে! জড়তা এবং অজ্ঞতার কঠিন বন্ধনে মানুষ মাটির সঙ্গে এক করে বাঁধা আছে যখন, জগতের কোনো কিছুরই উপর কোনো প্রভুত্ব নেই যখন মানুষের সেই আদিতম অবস্থা কল্পনা করতেও ভয় হয়!

এই নিরগ্নিক অবস্থায় থাকতে-থাকতে একটা সময়ে দেখি এক-এক দল মানুষ সূর্যপক্ক কাদা-মাটির হাঁড়িকুড়ি তৈজসপত্র গড়ার শিল্প-কৌশল এবং ক্রমে অগ্নি জ্বালাবার কৌশল এবং কাঁচা মাটির গঠনে নানা রকম নক্সাকাটা পাথরের ফলক প্রস্তুত এবং নানা রঙের মাটি দিয়ে গড়া জিনিসকে চিত্র-বিচিত্র করে তোলা ইত্যাদি শিল্পে অধিকার পেয়ে বসে আছে—বেত বোনার কৌশল, চামড়া সেলাইয়ের কৌশল, এমনি সব ব্যবহারিক শিল্পের কৌশল একদিনে পেয়ে বসেনি আদিযুগের মানুষ, অনেক যুগের অনেক সাধনার মধ্যে দিয়ে শিল্পবীর সমস্ত তারা যে চলেছে, প্রাগঐতিহাসিক এবং আদিতম মানবজাতির গড়া সমস্ত জিনিস তার সাক্ষ্য দেয়। হয়তো

প্রথম গড়লে মানুষ জল ধরার পাত্র এবং আহার্য রাখার স্থালী। তারপর এল আগুনকে জাগাবার প্রেরণা ও কৌশল! সেই কালের মানুষের শিল্প দিয়ে আশ্চর্য রকম সুন্দর করে, পারিপাট্য দিয়ে গড়া প্রহরণ সমস্ত তাকে নির্ভয় করলে। অগ্নি তাকে অভয় দিলে বাহিরের বৃহৎকায় জন্তু-সমূহ থেকে এবং রাত্রির অন্ধকার আর শীতের পীড়ন থেকে! এমনি নানাদিকের নানা ভয়, জলের ভয়, বাতাসের ভয় শিল্পকে অধিকার করে অতিক্রম করলে। নৌকা প্রস্তুত হল শিল্পকৌশলের দ্বারা, পারগামী এক ঘাট থেকে অন্য ঘাট, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে চলল শিল্পের অধিকার পেয়ে। মানুষের আদিতম শিল্পে তার প্রথম জয়যাত্রার আনন্দ ও উৎসাহের প্রভা ও তেজ লক্ষ্য করা যায়।

শিল্পের নানা কৌশল যেমন-যেমন অধিকৃত হতে থাকল তেমনি-তেমনি পার্থিব জীবনে তার ভোগের অধিকারও বেড়ে চলল। শিল্পবুদ্ধি মানুষের নানা সংকট থেকে যে বাঁচিয়ে এল সেই আদিকাল থেকে তা বলাই বাহুল্য।

ভাষাকে যখন আবিষ্কার করেনি মানুষ, শিল্পের অধিকার তখন পেয়েছে সে। সেই অধিকারের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হল যে মানুষ তার মতো দরিদ্র কোথায়?

শিল্পে অধিকার পেতেই হবে, না হলে আমরা কিছুই পাব না। ভারতবর্ষের জ্ঞানভাণ্ডার সব দিক দিয়ে যেমন দিনে-দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, শিল্পের দিক দিয়েও তার ব্যতিক্রম হয়নি, কিন্তু সেই শিল্প-ভাণ্ডারের চাবির উপর দাবী দিতে হলে আজকের আমাদেরও শিল্পীর অধিকার অর্জন করতে হবে। আমাদের সব দিক দিয়ে প্রমাণ করতে হবে শিল্পের এই উত্তরাধিকারের যোগ্য আমরা। শুধু ভারতবাসী এবং ভারতীয় এই জাতিগত প্রমাণ শিল্পের আদালতে গ্রাহ্য হবে না, শিল্পী কি নয় এটা প্রমাণ করা চাই। কালাপাহাড় ছিল ভারতবাসী, হাতুড়িও ছিল তার হাতে। কিন্তু ভাঙতে পটু গড়তে অক্ষম, উত্তরাধিকারী সত্ত্ব বজায় রইল না তার। সাজাহান বাদশা ছিলেন শিল্পরসিক, ভারত শিল্প-ভাণ্ডারের শির-তাজ পাওনা হল তাঁর।

শিল্প বিষয়ে যে জাতি উদাসীন, সে কি স্বোপার্জিত কি তার পূর্ব-পুরুষদের উপার্জিত শিল্পধনের অধিকার পায় না এ তো জানা কথা। তবু বলতে হয় যে শিল্পীর গড়া চমৎকার জলপাত্র না হলেও যখন অঞ্জলি

পেতে জল পান করা চলে, শাল কিম্বা কিংখাব না হলেও যখন গায়ে ছাই মেখেও শীত নিবারণ করা চলে তখন শিল্পের অধিকার শিল্প সাধনা কেন? এই উদাসী মত ও কুতর্ক করতে পারছি আমরা কেননা জানছি দরকার যদি পড়ে, অচল যদি হয় জীবনযাত্রা, তখন ভিক্ষার লোটা-কম্বলটার সংস্থান রেখেছেন শিল্পী কারিগর তাঁরা বাজারে! এরূপ কুতর্ক মানব-জাতির ভাগ্যক্রমেই ওঠেনি আদিম শিল্পী ও শিল্পবীরগণের মনে; বন্য অবস্থাতেও বনমানুষের কুটুম্বিতার কর্মভোগ থেকে উদ্ধার পেতে শিল্পকে তাঁরা আশ্রয় করেছিলেন বলেই আজ আমরা যুগমানব বলে একটা সজোরে উচ্চারণ করে বেড়াচ্ছি!

জড়তা থেকে মুক্তি দেওয়া, আনন্দ ও ভোগের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া এবং মানুষকে ক্ষমতাবান করে তোলা রসসৃষ্টি ও রূপসৃষ্টি বিষয়ে, এই হল শিল্পের কাজ। রসভোগের অধিকার শিল্পীর সত্য অধিকার! শিল্পের নানা কৌশল যেমন-যেমন অধিকৃত হল, মানবজাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও ভোগাধিকার ও নানা ক্ষমতা অধিকার বিস্তৃত হল, মানব-শিল্পের ইতিহাস এই কথা জানায়। মানব সভ্যতার ইতিহাস এই কথাই বলে। ভাবলোক, রূপলোক, রসলোক এই ত্রিলোকের অধিকার পেতে বিমুখ এমন মানুষ কোথায় আছে!

আমাদের দেশের শিল্প সম্বন্ধে ধাক্কা খেয়ে আমরা হঠাৎ সচেতন হয়েছি। ঘুমের ঘোর থেকে হঠাৎ এক-একদিন জেগে মনে হয় দরজা সব কটা হারিয়ে গেছে—চারদিকে দেয়াল! প্রাচীন শিল্প এবং সেই সব শিল্পে ওস্তাদ মানুষ সব থাকতে কি উপায়ে কোন রাস্তায় শিল্পকে অধিকার করা চলে তাই ভাবতে বসেছি আমরা, অথচ এই শহরের বুকেই শিল্পী পাড়া সমস্ত বিদ্যমান, কাঁসারীপাড়া পটুয়াটোলা কুমোরটুলি বাক্সপটি ইত্যাদি! প্রাচীন টোল ও চতুষ্পাঠিতে বিদ্যা দান হত যে ভাবে সেই ভাবে শিক্ষিত হয় গুরু-শিষ্য সম্পর্ক নিয়ে এই সব কারিগর পাড়াতে শিল্পশিক্ষার্থীরা। পেশা হিসেবে শিল্পশিক্ষা, যাকে বলা হয় আজকে ভোকেশানাল ট্রেনিং, সেই পন্থায় শিক্ষা চলেছে শহরে পল্লীতে। কামারের শিল্প, কুমোরের শিল্প, ছুতোরের শিল্প, পটুয়া-শিল্প, চামারের শিল্প, পিত্তলকারের স্বর্ণকারের শিল্পশিক্ষা সহজে নিস্পন্ন হয়ে চলেছে। যে শিল্পশিক্ষাকে অধিকার করতে চাই তার বিষয়ে উপদেশ দেবার লোকের অভাব নেই। কিন্তু তাদের উপরে শ্রদ্ধাও নেই, বিশ্বাসও নেই এমন আমাদের যে তাদের

প্রথা ও শিক্ষাপ্রণালীকে আধুনিক শিল্প-শিক্ষালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্থান দিই। ঐসব শিল্প-বিষয়ে সুশিক্ষিত কিন্তু কলেজ স্টুডেন্টের তুলনায় সম্পূর্ণ নিরক্ষর কারিগর তাদের মোটা মাহিনায় টিচারের পদ দেওয়া তো বহু দূরের কথা। তারা অক্ষর কাটুক যতই কেননা সুন্দর, তবু যে তারা নিরক্ষর এই রকম সংকোচ নিয়ে শিল্প অধিকারে অগ্রসর হলে শুধু যে আমরাই শিল্পের উত্তরাধিকারে বঞ্চিত হব তা নয়, জগতের লোককে বঞ্চিত করব নিজের করতলগত হল না যে রসের পাত্র, সৌন্দর্যের আয়োজন, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অযতনে নাশ করে।

প্রাচীন শিল্পপন্থার উপর অশ্রদ্ধা এবং এই যে কারিগরদের উপর অবিশ্বাস এতে করে শিল্পকে অধিকারের পথ আমাদের পক্ষে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ করে তুলছে, 'অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি!'

······২······

Those organs which guide an animal are under man's guidance and control—Goethe

শিল্পবুদ্ধি ও রসবোধের দ্বারা চালিত হচ্ছে যে মানুষের দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি সেই শিল্পী নাম পেলে শিল্পরসিক বলে বলা চলল তাকে! দৃষ্টি দিয়ে যে বুঝে নিলে সৃষ্টির বিচিত্র রূপ ও তার রহস্য সেই হল রূপকার বা রূপশিল্পী; তেমনি কথাশিল্পী সুরশিল্পী বাকশক্তি ও শ্রবণশক্তির সাধনায় নিপুণতা লাভ করে সৃষ্টির বিচিত্র সুরে সুর মেলাবার রহস্য অবগত হল।

জন্তুজানোয়ারদের ইন্দ্রিয় সমস্ত, চোখ-কান হাত-পা সবই লক্ষ্যভেদ শব্দভেদ করে—শিকারে পাখি সে কোনো সাধনা না করেই স্বভাবত দূর-দৃষ্টি পেয়ে গেছে। শিল্পী নিজের শিল্পসাধনার দ্বারায় দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণ শুধু নয় অন্তর্দৃষ্টি এবং সৃষ্টির গভীরতম অংশে দৃষ্টি দেবার উপযুক্ত হল। এখন বলতে পারি সঙ্গীত কবিতা ছবি প্রভৃতি শিল্পে-কুশল হয় না চোখ কান হাত, যতক্ষণ না এদের স্বাভাবিক কার্যকরী চেষ্টাকে সাধনার দ্বারায়, শিক্ষা ও চর্চার দ্বারায় শিল্পের বিশেষ-বিশেষ দিকে লক্ষ্যভেদের কাজের উপযুক্ত করে তোলে মানুষ।

আমাদের সচরাচর মোটামুটি দর্শন-শ্রবণাদির সঙ্গে শিল্পীর ও গুণী-জনের বহুশ্রুতি ও ভূয়োদর্শনের পার্থক্য আছে, সেই কারণে ছবি কবিতা সুর-সাঁর প্রভৃতির মর্মগ্রহণের বেলায় দর্শক ও শ্রোতাদের দিক থেকে খানিক রস-সাধনার আবশ্যকতা আছে।

কবিতা 'রসমাধুর্যং কবিবেত্তি'—ছাগলের সামনে ছবির কাগজ ধর সেটা সে চিবিয়ে খাবে। ছেলের হাতে দাও ছবিখান, কচ্চিৎ একটা ছেলে সেটাকে দেখবার বস্তু বলে ভাববে, আর একটা হয়তো সেটাকে মাটিতে পেড়ে বসার আসন করব ভাববে।

মানুষের সৃষ্টি করা শিল্পকে বুঝতে যদি সাধনার দরকার এটা বুঝি, তবে সৃষ্টিকর্তার এই সৃষ্টিরচনার ভিতরের ও বাহিরের রহস্য বুঝে চলার জন্যে শিল্পী-মানুষকে কতখানিই না সাধনা করতে হয়।

২ (৮৯)

'The Scene which the light brings before our eyes is inexpressively great, but our seeing has not been as great as the Scene presented to us ; we have not fully seen! We have seen mere happenings but not the deeper truth which is measureless joy.—*Rabindranath.*

কুরু-পাণ্ডবে মিলে একশো-পাঁচ ভাই, দ্রোণাচার্য যখন তাদের আন্দাজের পরীক্ষা নিতে গেলেন তখন দেখা গেল একশো-চার ভাইয়ের মোটামুটি দৃষ্টি আছে, নির্ভুল স্থির লক্ষ্য একমাত্র অর্জুনেরই আছে! আমাদের দুটিমাত্র চোখের দৃষ্টি, একটু অন্ধকারে ঝাপসা দেখায় পথ, বেশি আলোর ঝলকে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে দিকভ্রম লাগায়। সাধনার দ্বারায় সেই দৃষ্টি মার্জিত না হলে রসবিষয়ে অন্ধতা থেকেই যায়, নয়ন ভরে সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখে নেওয়া চলেই না! হাজার-হাজার লোক গোলদীঘিতে বেড়াতে যায় রোজই, কিন্তু গোলদীঘি গোল না চৌকা, গোলদীঘির লোহার রেলিং ত্রিশূলের আকার না বল্লমের আকার প্রশ্ন করলে একশোর মধ্যে দশজনের চোখ পাশ নম্বর পায় কিনা সন্দেহ! চোখ সবার তৈরি থাকে না সে ভাবে যে ভাবে চিত্রকরের দৃষ্টি নোট নিয়ে চলে দ্রুত! বায়স্কোপের ছবি-নেয়া-কল যেন এমনি ভাবে কাজ করে চলেছে চোখ-কান। মানুষের বুদ্ধির কোঠায় সচিত্র ও সশব্দ খবর পাঠাচ্ছে এরা যথা—হ্যালো গাড়ি আসছে দেখ; ভেঁপুর শব্দ চাকার শব্দ পাচ্ছ সাবধান; কলের বাঁশি বাজল চল কারখানায়! খুব ছোট ছেলের কাছেও দর্শন স্পর্শণ শ্রবণেন্দ্রিয় সমস্ত এরা খবরদারীর কাজে দিনরাত নিযুক্ত রয়েছে। বলছে, 'রাতি পোহাইল উঠ বাছাধন, কাক ডাকিতেছে কররে শ্রবণ' কিম্বা 'ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল' কিম্বা 'শীতল বাতাস বহে জুড়ায় শরীর।'

শুনে দেখি, চেয়ে দেখি, পরশ করে পরখ করে দেখি—সাধারণত গোটা-কয়েক দিক দিয়ে বস্তুজগতের বাহিরের পরিচয় লাভ করেছি আমরা, কি শিল্পী কি সাধারণ মানুষ। শিল্পীর দেখায় আর সাধারণের দেখায় তফাত হল কেবল সেইখানে যেখানে কাজ-ভোলা দৃষ্টি, চির-তরুণ দৃষ্টি নিত্যকার কাজের থেকে নির্লিপ্ত হয়ে বস্তুর ধ্যানে নিবিড়ভাবে নিযুক্ত হবার অবসর পেয়ে যাচ্ছে।

ছুটির দিনের দৃষ্টিতে চাই সৃষ্টির দিকে আর কলের কুলির পরিশ্রান্ত

ক্লান্ত দৃষ্টিতে চাই জগৎটার দিকে। দুটো ছাপ পাই দুবারে। তরুণ দৃষ্টিতে, শিশুর সরল দৃষ্টিতে সৃষ্টির সমগ্র সামগ্রী কৌতুক রহস্যময় অতি চমৎকার দেখায়। শিল্পীর দৃষ্টিতে বিশ্বের বিরাট রহস্যের বিচিত্র সৌন্দর্যের মর্ম উদ্ঘাটিত হয়!

কাজের জগতে চলাচল করতে-করতে কাজের দৃষ্টি অভ্যস্থ পরকলার মতো চোখের পরে এমন শক্ত হয়ে বসে যায় যে চলতি দেখা-শোনা থেকে দৃষ্টিকে শ্রবণকে যে মুক্তি দিতে হয় শিল্পী হতে হলে, কবি হতে হলে এবং তাদের রচনার মর্মগ্রহণ করতে হলে একথা ভুলে বসি আমরা স্বভাবত!

শিল্পকর্মীর দেখা এবং শিল্পরসিক ভাবুকের দেখা এই দুই দেখার ফলে পায় শিল্পরচনা পরিপূর্ণতা।

কাজের মানুষ যারা আপনাদের দৃষ্টিতে কাজের-কাজল-পরকলা দুখানা ঠুলির মতো করে চিরকালের জন্যে ঢাকনা দিয়ে ফেলেছে তাদের পক্ষে বোঝাই মুশকিল হয়ে পড়ে আর্ট। তারা ভেবেই পায় না আর্টের মাথামুণ্ডু বলে থেকে-থেকে কি অনাসৃষ্টি দেখছে আর্টিস্টরা। কি বা দেখাতে চাচ্ছে, কি শোনাচ্ছে, কি বা জানাচ্ছে!

শিশুর বিস্ময় যে ভাবে গিয়ে স্পর্শ করে বিশ্বচরাচরকে একমাত্র ভাবুক আর শিল্পী সেই ভাবের সহজ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারে চেয়ে সৃষ্টির রসের প্রকাশ সমস্ত দিকে।

ওপারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌
এপারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুক করে
গুণবতী ভাই আমার—

শিশুর মতো সরল চোখে চাওয়া বিশ্বছবির দিকে, এর মধ্যে আর্ট যে আছে বলে মনেই হয় না। অথচ খুব ছোট একটি সদ্য ফোটা ফুলের চাওয়ার মতো সুন্দর এই দুটি ছত্র ছড়া, গভীর এর ব্যঞ্জনা। আমাদের তরুণ চোখে একদিন নদী পারের দৃশ্য যে ভাব জাগিয়ে দিত চিত্র-কাব্যের এই টুকরোটুকুতে সেইটেই যেন ভাষা পেয়েছে।

এই বার অত্যধিক মাত্রায় কাজের দৃষ্টি দিয়ে দেখা শয্যাবিলাসী ও ভোজনবিলাসীর দলের কবির বাস্তব আর্ট দিয়ে লেখা একটা চিত্র দেখি :

সুন্দরীর সহচরী ভালো জানে চর্যা
রতন মন্দিরে করে মনোহর শয্যা।
দুই দুই তাকিয়া খাটের দুইধারি,
ডোল ভাঙ্গি খাটাইল চিকন মশারি।
ভক্ষ্য দ্রব্য নানা জাতি মণ্ডা মনোহরা,
সরভাজা নিখুতি বাতাসা রসকরা।
অপূর্ব সন্দেশ নামে এলাইচদানা
ফুলচিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা—

এই যে দুটো ছড়া তোলা গেল, এ দুটোর যদি চিত্রকরকে দিয়ে ছবি লেখানো যায় তো আর্টের হিসেবে জিত হবে ছেলে-ভুলোনো মেয়েলী ছড়াটার। দ্বিতীয়টা শিল্প-শৌখিন পাটের বড় দালালের বাগানবাড়ির নাচঘরের পাশে ছোট ঘরটায় স্থান পাবে, চওড়া গিল্টির ফ্রেমে-বাঁধা হয়ে দেয়াল শোভা দেয়ালগিরির সামিল হয়ে বাহবা পাবে খানিকক্ষণ।

শিশুর দৃষ্টি আর এক শিল্পী বা কবির দৃষ্টিতে খুব কাছাকাছি মিলেছে কি ভাবে তা দেখেছি। এখন শিল্পদৃষ্টি যার মোটেই হল না কিন্তু ছাঁদ ছন্দ বর্ণন ইত্যাদিতে খানিক-খানিক দখল জন্মাল এমন লোক একটা রাত্রির দৃশ্যপট আঁকলেন। ছবিটা হল কেমন, যথা :

মন্ত্রীরূপে চারিদিকে যত তারাগণ
ঘেরিয়াছে নলিনীরে শৈবাল যেমন।
শশী আর তারাবৃন্দ গগনে শোভিত,
দেখিলেই মনোপদ্ম হয় প্রফুল্লিত—

সোম রাজা, বুধ মন্ত্রী! পাঁজির ছবিতে যে অকুণ্ঠিত শিশুপনা দেখি এতে তা নেই। শুধু রঙ তুলি কলম কালি নিয়ে জ্যাঠাপনা বিদ্যমান। একথা যেন কেউ না ভাবেন সোজা দৃষ্টিতে শিল্পের চশমা-পরা বাঁকা দৃষ্টিতে দেখা অর্থাৎ যা দেখছি তার উল্টোটা দেখাই হল শিল্পদৃষ্টি! দুষ্মন্ত রাজার বিদূষকের দৃষ্টি অত্যন্ত মোটা রকম ছিল, তার মোটা পেটেরই মতো, তাকে রাজা বলেছিলেন : 'অনবাপ্ত চক্ষুঃ ফলোসি, যেন ত্বয়া দ্রষ্টব্যানাং পরং ন দৃষ্টম্।'

ভাবুক, কবি, এরা পেয়েছে কাজ-ভোলা দৃষ্টি আর পল্লীপাঠশালার হেডমাস্টার মশায়—কাজের দৃষ্টি তাঁদের। কবি থাকেন শহরে, হেডমাস্টার থাকেন পল্লীগ্রামে, দুজনকে দৃষ্টি-পরীক্ষায় নামানো গেল। প্রশ্ন হল—মাঠ বর্ণনা কর! কবি বসে ভাবের চশমা ধরলেন, মাস্টারমশায় ধরলেন কাজের চশমা!

মাস্টার মাঠ বর্ণন করলে :

হে বালক মাঠে গিয়ে দেখে এস তুমি
কত কষ্টে চাষালোক চষিতেছে ভূমি।
পরিপাটি করে মাটি হয়ে সাবধান,
তবে তায় শস্য হয় ছোলা মুগ ধান।

কবি একটি ছত্রের ছোট একটি বর্ণনা দিলেন :

পরিণত - বহুশালি - ব্যাকুল - গ্রামসীমা
সততমতি মনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চনাদোপগীতঃ।

শহুরে কবির জয় হল, কিন্তু পাড়াগেঁয়ে হেডমাস্টারমশায়ের মাঠ বর্ণনা টেকস্ট বুক কমিটির অনুমোদিত নীতি-কবিতা-মালায় বেখরচায় ছাপা হয়ে গেল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পুরস্কার বিতরণের দিন আবৃত্তি করলে, সুরসহযোগে গীত করলে ছেলেমেয়েরা!

এখন দেখছি ভাবুক ও শিল্পী সেই সাধনার বলে শক্তিমান যে সাধনা প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সঙ্গে মনকে, শ্রোত্রের সঙ্গে আত্মাকে যুক্ত করে। এই যে নতুন, দর্শন-শ্রবণ-কথনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হল মানুষের আত্মগত ও বিশ্বের অন্তর্নিহিত রসাত্মরচনা : কবিতা, ছবি, গান, সেই সমস্তকেই বলা চলে দেব-শিল্প অনুসারে রচিত শিল্প-রচনা।

শিল্প-সাধকের দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি—তাই নিয়ে দেখলেন পূর্বতন ঋষিরা এবং বললেন এই ব্রহ্মলোক, এখানে ছায়াতপে (লাইট এ্যান্ড সেড) সকল কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে, গন্ধর্বলোক সেখানে সমস্তই যেন জলের উপর তরঙ্গিত হচ্ছে (মিউজিক, কালার), আত্মার মধ্যে দর্পণে প্রতিবিম্বিত যেন সমস্তই দেখা যাচ্ছে। অভূতপূর্ব ত্রয়ী সাধনা মানুষকে

দিব্য জ্ঞান এবং দিব্য শক্তিমান হয়ে সৃষ্টির রস উপভোগের অবসর দিলে যখন, তখন অরূপকে রূপ অসুন্দরকে সুন্দর অবোলাকে সুর দিয়ে চলল শিল্পী-মানুষ। জড়েতে প্রাণের সাড়া পেঁছুল, পাষাণেতে করুণা-ধারা ছুটল—

প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে!

······৩······

'বীণা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে,' এই সরস্বতীর স্তোত্রটা বাংলা ভাষাবিদ শুনলেই কপালে হাত ঠেকাবেন, চীনেম্যানের কাছে এটা ঠেকবে দুর্বোধ্য! কথার মানে বুঝতে হলে ভাষা-শিক্ষার দরকার। ছবির মূর্তির ভাষা সার্বজনীন ভাষা—কাক বললে সবাই বুঝবে না কি বোঝাতে চাচ্ছি, কিন্তু সেটা এঁকে দেখালে জগৎসুদ্ধ লোক বুঝবে। আবার ছবি দেখাতে এবং ছবির রূপাক্ষর লেখা ভাষাজ্ঞানে অপরিপক্ক এমন অনেকে আছে যারা দেখেও বুঝবে না কি দেখিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে তাকে। এই শেষের ঘটনা পাঠকের বা শ্রোতার বা দর্শকের দোষে ঘটতে পারে কিম্বা যে শিল্পী সে কাক লিখতে কাক রাজার নাতি লিখে বসে যদি! কথিত ভাষার সঙ্গে চিত্রিত ভাষার পার্থক্য এই যে কথিত ভাষা সার্বজনীন নয়, চিত্রিত ভাষা সার্বজনীন। 'আবর্' কথাটা শুনলে ফরাসীজাতি বোঝে 'গাছ,' ঐ 'আবর্' কথা হিন্দুস্থানীর কাছে মেঘ-রূপে দেখা দেয়, ইংরেজ অনেক তর্কাতর্কির পরে ঐ শব্দটাকে 'আর্বার' বা বাগান বলে বুঝবে। কিন্তু আঁকার ভাষা গাছকে গাছ, মেঘকে মেঘ, কাননকে কাননরূপেই দেখায়। কথিত ভাষার কৃত্রিম উপায়ে একটা-একটা শব্দের সঙ্গে একটা-একটা অভিধা গায়ের জোরে চাপিয়ে দেয় না।

শব্দের সঙ্গে রূপকে ওভাবে জড়িয়ে-জড়িয়ে নিয়ে এল কথিত ভাষা। নবঘনশ্যাম—এই কথাটা রূপ ও রঙ দুটোরই উদ্রেক করলে ভাষাবেত্তার মনে। শব্দের সঙ্গে রূপ দিয়ে জীড়য়ে বাক্য হল উচ্চারিত ছবি। তেমনি চিত্র হল রূপ-রঙ ভাব-ভঙ্গী ইত্যাদি নিয়ে চিত্রিত কথা। অভিনেতার ভাষা দু-তিন প্রকার ভাষা মিলিয়ে। সবাক ছবির ভাষা—বাক্যসমূহকে সুর-সার ভাব-ভঙ্গী রূপসজ্জা ইত্যাদি দিয়ে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া গেল নেপথ্য থেকে শিখিয়ে-পড়িয়ে। শুরু হল সুর-সার বাক্য দৃশ্যপটাদি নিয়ে যাত্রা। করিবর রাজহংস-গতি-গামিনী—চললিহুঁ সঙ্কেত গেহা। কথিত ভাষা বা পঠিত কথা চলে সুর-সার ছন্দ ইত্যাদি ধরে। 'কাক' বলে বসে থাকা চলে না। রূপকথা বলার বেলায় কাককে

চলাতে হল বলাতে হল তবে চলল খানিক কথামালার গল্পের মজলিস। 'কাজল কাকল পাখি শৃকাল চন্দ্রমুখী, মহারাজা ছাতা মাথায় বৈয়া রৈচে বেঙ'—তিনজনে চুপচাপ বসে আছে এমন কালে—'ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে ঠেকাইল চেঙ!'...এই ভাবে কথাচিত্রে ক্রমে এগোতে থাকল কথামালার কাক শৃগাল বেঙের ঘটনাবলী।

ছবির বেলাতে কি কৌশল প্রয়োগ করেন চিত্রকর দেখা চাই : একটা কাক এঁকে দেওয়া গেল, একটা শৃগাল, একটা বেঙ ছাতার তলায়, বিশেষ্যের মতো এরা নিজের পরিচয় মাত্র জানিয়ে চুপ রইল। একটু রঙ-ঢঙ দেওয়া গেল ছবিতে—শৃগাল যেন ছলছল নেত্রে বলছে কাকের দিকে চেয়ে, 'কাহারে কহিব দুঃখ কে জানে অন্তর!' কাককে এমনি চালানো যেতে পারে ছবিতে ভঙ্গী দিয়ে—'চলিতে না পারে রসের ভরে, আলস নয়নে অলস ঝরে; ঘন-ঘন সে বাহিরে চায়, আনছলে কত কথা জানায়।' বেঙকে বড়-বড় কবিরা কথাচিত্রে বলিয়ে ছেড়েছেন, বড় জাপানী চিত্রকরেরা খেলিয়ে ও চলিয়ে ছেড়েছেন—'মন খেলাও রে ডাণ্ডাগুলি আমি তোমা বিনা নাহি খেলি—এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল চম্পাকলি ধুলা-ধুলী'—দণ্ডাঘাতে গুলির মতো বেঙ ধুলোর পরে তিন-চারটে ডিগবাজি খেয়ে চাঁপাগাছের তলায় সাপের গর্তে লুকিয়ে গেল! চিত্রের ভাষা নিছক ইঙ্গিতের, চিত্রে চলা-বলা সবই ভাব-ভঙ্গী দিয়ে ইঙ্গিতে বোঝাতে হয়। নাট্যকলা ও নৃত্যকলা প্রধানত তাই। কথিত ভাষা কিছু-কিছু জোড়া গেল তাতে সুর-সার দিয়ে—নট ঘুড়ি-ওড়ানোর ভঙ্গীতে নেচে চলেছে, কথা গীত হচ্ছে সুরে তালে সঙ্গে-সঙ্গে—'অং-অং ভুস্-ভুস্, বোঁ বন্-বন্, সোঁ সন্‌সন্, হিংটিংছট আয় চটপট, লাগ্ লাগ্ প্যাঁচ কেটে গেল ক্যাঁচ ভোঃকাট্টা! ঠিক রোদ্দুরে বাতাস উত্তুরে, তালপুকুরে ঘুড়ি পড়ে ঘুরে খেয়ে গোঁত্তা!' কথাগুলো বাদ দিলেও নট শুধু ভঙ্গীতে অনেকটা ইঙ্গিত করে নাচের আগাগোড়া সুসম্পন্ন করতে পারেন।

আকাশ যেমন রঙের ইঙ্গিতে ভাব ব্যক্ত করে ছবিও কতকটা তাই। সঙ্গীত কথা বাদ দিয়েও সুর মিড় মূর্ছনাদির সাহায্যে মুখর হয়ে ভাব জাগায় শ্রোতার অন্তরে। কবিতা কথা বাদ দিয়ে লেখা চলে না—মনোভাব বাচন হয় কথা দিয়ে, দৃষ্ট রূপ বর্ণিত হয় কবিতায় কথার সাহায্যে। মনোভাব বাচন হচ্ছে যেমন :

একে কাল হৈল মোর নয়নি যৌউবন,
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন;
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল,
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল;
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্ধন;

মুখের কথার সঙ্গে গাঁথা হয়েছে নবযৌবনী রূপ, বৃন্দাবনের রূপ, কদম্ববৃক্ষের রূপ, যমুনা নদীর রূপ, রতনভূষণের ঝিকিমিকি প্রভা, গিরি গোবর্ধন! শুধু শেষের দুই ছত্রে ছবি নেই কেবলমাত্র মনোভাব বাচন হয়েছে :

এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী
এমন ব্যথিত নহে শুন এ কাহিনী।

কথিত ভাষা হলেও কিন্তু একেবারে ওরিএণ্টাল আর্টের ছবি হল এটা, যেমন :

জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জন কানু উদয় হয়েছে সুধাময়
নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল নিমেষে নিমিখ নাহি রয়
সই দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে—

আবার আর একটা ছবি :

চলিতে না পারে রসের ভরে, আলস নয়নে অলস ঝরে
ঘন-ঘন সে বাহিরে যায়, আন্‌ছলে কত কথা বুঝায়!

চিত্রের ভাষা, অভিনীত ভাষা, কথিত ভাষা, যদি এসব এ-ওর কাছে লেনা-দেনা করে চলল তবে এই নানা ভাষার ব্যাকরণ অলঙ্কার ইত্যাদির সূত্র সকলে মিল খানিক-খানিক থাকতে বাধ্য। কথিত ভাষার ব্যাকরণে

যাকে বলে ধাতু, ছবির ভাষায় তাকে বলি 'ধাঁচ' 'ধাঁচা' বা ইংরাজিতে যাকে বলে 'ফরম্'। দেশী কারিগর চলতি ভাষায় যাকে বলে 'কাঠামো'; 'ফর্মাও' বলে আজকাল।

ধাতু ও প্রত্যয় একত্র হল তবে পেলাম শব্দরূপটি কথিত ভাষায়। চিত্রিত ভাষাতেও এই নিয়ম। ধর, মাথা-হাত-পা ইত্যাদি দিয়ে এক ধাঁচের একটা কাঠামো প্রস্তুত করা গেল কিন্তু কাঠামোটা নরের নারীর অথবা বানর কি বানরীর বোঝানো দুষ্কর হল 'প্রত্যয়' দিয়ে রূপটাকে বিশেষিত না করলে। তার উপর বিভক্তি যিনি ভাগ করেন এ-রূপেতে ও-রূপেতে তা দিয়ে চিহ্নিত করতে হল—নর নয় বানর বোঝালাম ল্যাজ জুড়ে। বানরের সঙ্গে গাছপালার, নরের সঙ্গে ঘর-দুয়ারের সম্বন্ধ ঘটিয়ে, তবে ক্রমে না সূত্র ধরে চিত্রটি পরিপূর্ণ আকার পেলে।

কথিত ভাষায় ভৃ ধাতু গফ প্রত্যয় হল ভৃঙ্গ; চিত্রিত ভাষায় কালো ফোঁটা আর দুটো রেফ যোগ করে হল পরিষ্কার দ্বিরেফ-ভৃঙ্গ। আবার ভৃঙ্গের কালো ফোঁটায় র-ফলার বদলে য-ফলা দিয়ে হল ভৃঙ্গার! ছবি প্রত্যয় জন্মিয়ে দেয় এভাবে বস্তুরূপটার।

ছবি লেখার পরিশ্রম নিতে চায় এমন জনকতক ছাত্রকে ছবির ব্যাকরণ লিখতে লাগিয়ে দিলে ছবি আঁকার কাজ শেখানো সহজ হয়ে আসে পড়ুয়াদের পক্ষে।

সংকীর্তিত ভাষা ও সংচিত্রিত ভাষা, দুটো বোঝাবার পক্ষেই ভাষাজ্ঞান থাকা চাই প্রথমেই। 'রসগোল্লা খেতে মিষ্টি'—এটুকু বুঝতে ভাষাজ্ঞানের দরকার নেই, মোটামুটি রসজ্ঞান থাকলেই হল। কিন্তু ভাষাজ্ঞান রসবোধ বেশ একটু না থাকলে শিশুবোধের বিদ্যা নিয়ে রসসৃষ্টি থেকে রস পেতে চলায় ঠেকতে হয় পদে-পদে।

ছবি, মূর্তি ইত্যাদির অপ্রচলনের সঙ্গে তাদের ভাষা ও ব্যাকরণাদির জ্ঞান লোপ পেয়েছে। ডেড্ ল্যাংগোয়েজ—মৃতভাষার মধ্যে পড়ে গেছে সংচিত্রিত ভাষা! ইজীপ্তের চিত্রাক্ষরের মতো দুর্বোধ হল দিনে-দিনে চিত্র মূর্তি সব আমাদের কাছে এইটুকু ভুলে গিয়ে অনেকেই এখন বলে থাকেন —চোখে দেখামাত্র যার সবখানি বোঝা গেল না সে ছবি, মূর্তি ধরতব্যের মধ্যেই গণ্য করা চলে না! আমাদের নিজ বাঙলার মুখের কথা পল্লীভাষা বা পালিভাষাটাকে কতটা ভুলেছি সাধুভাষার চর্চা করতে-করতে সেটুকু দেখ। 'ছীয়াল' 'ছিমনি' 'ছোলঙ্গ' অত্যন্ত চলতি বাংলা শব্দ, কিন্তু বুঝলে

কিছু? ফরিদপুরের ভাষা যে জানে 'ছোলঙ্গ' বলতে যে বাতাবিলেবু বোঝায় সে বুঝবে। বহরমপুরী লোক বুঝবে না, হয়তো অভিধান খুলে সে বুঝবে—নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমল বীজপুর! 'ছীয়াল' 'ছিমনি' এ দুটোও দুর্বোধ্য। কোনো পণ্ডিত ছীয়ালকে 'শৃগাল' তথা 'শেয়াল' তথা ছীয়াল ইতি অপভ্রংশ বলে ঠাউরে নেবেন। ছিমনি কথাটা ইংরাজি চিম্‌নি-র থেকে ভাঙা বলেও ধরবেন অনেকে। কিন্তু বাংলা শব্দকোষ খুললেই দেখবেন 'ছীয়াল' বলতে 'শ্রীল' 'শ্রীমান' 'শ্রীমতী'কে বোঝায় আর 'ছিমনি' মানে পাথর-কাটা 'ছেনি'। দুশো বছরও হয়নি বাংলা ভাষার জ্ঞান এরি মধ্যে লোপ পেয়েছে, আর অনেক দুশো বছর হল শিল্পের ভাষা নিয়ে কমই আমরা নাড়াচাড়া করছি এতে করে ছবি, মূর্তি বোঝা সহজ হবে কেমন করে আমাদের পক্ষে?

দেবমাতা অদিতি তিনি স্বর্গেই থাকেন, দেবভাষাতেই তাঁর দখল, একদিন তিনি শুনলেন জল চলেছে সশব্দে। দেবমাতা বামদেবকে শুধোন —'অ-ল-লা শব্দে যেন উলু-উলু দিতে-দিতে নদী সব কোথায় চলেছে ওদের শুধিয়ে জানো তো বামদেব!' ঋষি প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা নিয়ে বসে-ছিলেন জলের ধারে, জলের ভাষা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না, তিনি জবাব দিলেন, 'জলবতী নদীগণ ইহাই বলিতেছে—মেঘ সকলকে ভেদ করে জলসমূহের এমন শক্তি কোথায়? ইন্দ্রই মেঘকে বিনাশ করতঃ জলসমূহ মুক্ত করেন, মেঘের আবরণ ইন্দ্রই ভেদ করেন।'

অরণ্য একখানি সুন্দর দৃশ্যপটের মতো দেখা যাচ্ছে, দেবমুনি সেদিকে চেয়ে চিন্তা করছেন—'অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি' ইত্যাদি—হে অরণ্যানি! তুমি যেন দেখতে-দেখতে লুপ্ত হও, কত দূরে তুমি চলেছ। অরণ্যানি! তুমি গ্রামের বার্তাই লও না, তোমার ভয় নাই এমনি ভাবে একাকী আছ: জন্তুরা বৃষের ধ্বনিতে কি যেন জানায়, উত্তর সাধক পক্ষীরা চিচ্চিক স্বরে যেন প্রত্যুত্তর দেয়—এ যেন বীণার ঘাটে-ঘাটে ঝনৎকার দিয়ে কারা সকলে অরণ্যানীর মহিমা কীর্তন করছে! বনানীর মধ্যে কোথাও যেন দেখি গাভী চরছে, কোথাও দেখি অট্টালিকা সমস্ত যেন দৃশ্যমান, ছায়ালোকে মণ্ডিত সায়ংকালের অরণ্য—মৃগগণের জননীস্বরূপা অরণ্যানী... মৃগনাভি গন্ধ সুরভিত অরণ্য!...

মেয়েরা যে আলপনা টানলে তাতে অনেক জিনিসের প্রতীক লেখা আছে দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে পিটুলির রঙ দিয়ে সংচিত্রিত ভাষাতে

ধরিত্রী নিরূপিতা হলেন পদ্মপত্রের একটি বুদ্বুদ আকারে। তেমনি কথিত ভাষায় রচিত হলেন পৃথিবী—'হে বিচিত্র গমনশালিনী পৃথিবী, স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্র দ্বারায় তোমার স্তব করেন!' জীবন্ত হরিণ দ্রুত দৌড়েছে—তাকে চিত্রের ভাষায় ব্যক্ত করতে হলে চাই গতিশীল রেখা। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ অকার থেকে ক্ষ নিয়ে লিখিত হল কথিত ভাষার উপাদান। এমনি রেখাক্ষর ও বর্ণমালা প্রভৃতি হল চিত্রে ভাবাদি নিরাকৃত করে ধরার উপায় এবং অঙ্কের পর অঙ্ক ধরে নানা ভঙ্গী নানা রূপের সমষ্টি নিয়ে হল অভিনয়ের সৃষ্টি। ঋষি বলেছেন—'হে বৃহস্পতি, বালকেরা সর্বপ্রথম বস্তুর নাম মাত্র বাচন করতে পারে, তাহাই তাহাদের ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান। বালকদিগের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল—বাগ্‌দেবীর করুণাক্রমে তাহা প্রকাশ পাইল... যেমন চালনীর দ্বারায় শক্তুকে পরিষ্কার করা হয় তেমনি বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন... বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞদ্বারায় ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন!'

ভাষাকে পাওয়ার পূর্বেও বিশ্বরাজ্যের প্রকট রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ সমস্তই পাচ্ছিল মানুষ। কি পাচ্ছে, কি দেখছে, কি শুনছে সেটা প্রকাশ না করতে পারার বেদনা, মনের কথাকে খুলে বলতে না পারার বেদনা, মানসকে ব্যক্ত না করতে পারার উপায়—সমস্তের অভাব বোধ করছিল মানুষ। বৈদিক ঋষিরা ভাষাতে এটা ব্যক্ত করলেন—'আমার চক্ষু কর্ণ, আমার হৃদয় নিহিত জ্যোতি, সমস্তই তোমাকে নিরূপণ করিতে, অবগত হইতে ধাবিত হইতেছে... দূরস্থ বিষয়ক চিন্তা ব্যাপৃত আমার হৃদয় ধাবিত হইতেছে... আমি এই বৈশ্বানর স্বরূপকে কিরূপে বর্ণন করি, কিরূপেই বা হৃদয়ে ধারণ করি!... যজ্ঞের সময় দেবতারা আমাদিগের স্তব শুনিয়া থাকেন, সেই বিশ্বদেবতা সকলের কাহার স্তব কি উপায়ে উত্তমরূপে রচনা করি... হে বৃহস্পতি! আমাদিগের মুখে এমন একটি উজ্জ্বল স্তব তুলিয়া দাও যাহা অস্পষ্টতা দোষে দূষিত না হয় এবং উত্তমরূপে স্ফুরিত হয়!'

ছবি দিয়ে যে কিছু বলতে চায় সেও এই প্রার্থনাই করে—রঙ রেখা ভাব লাবণ্য অভিপ্রায় সমস্তই যেন উজ্জ্বল এবং সুন্দর হয়ে ফোটে!

ভাষাতে ভাসা-ভাসা রকমের দখল নিয়ে কাজ চলে না ভালো রকম, না ছবিতে না কবিতায় না কোনো কিছু শিল্পে। যে ভাষা প্রয়োগ করেছে

সেই দেখে মন দিয়ে লেখা তীরের মতো সহজ সরল গতিতে রস পেঁছে দেয় মনে। মনে রইল ছবি ভাব রঙ-ঢঙ সমস্তই। প্রকাশের ভাষার উপর দখল রইল না ভালো রকম তাতে করে ঠেকল কাজ, ছবিটা হল চলনসই অপেক্ষাও অচল!

হাওয়া যেখানে নেই সেখানে শব্দ হয় না, জ্বালাতে গেলে আগুন জ্বলে না ধোঁয়াই হয়। আলো যেখানে নেই রূপ সেখানে থেকেও নেই। তেমনি মন যেখানে নেই, কথা সেখানে থেকেও নেই! ছবি ও কবিতায় মনের বেদন ঠিক নিবেদন করা গেল তবেই রস জাগল। মুখে বলে যাওয়া কথা আর মনের সঙ্গে বলে যাওয়া কথায় ও লেখায় অনেকখানি ধরন-ধারণের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মন যে রচনাকে ফাঁকি দিয়ে গেল তাকে খুব জমকালো বাক্য, মন্দ্র মধ্যম তার স্বর অথবা রঙ-চঙ ঢঙ-ঢাঙ শব্দকোষ অলঙ্কার ব্যকরণ ইত্যাদির কৃত্রিম উপায় দিয়ে ভাসা-ভাসা রকমের একটা ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করাই চলল, যথা :

ভবজ অনুজ রথ তা তলে বিনতাসুত কোরে কুমুদ বন্ধু সাজে,
হরি অরি সন্নিধানে অলিরস পুরে বাণে রমনী মুনির মন বান্ধে।
খগেন্দ্র নিকটে বসি রসেন্দ্র বাজায় বাঁশি যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়
কুন্তির নন্দন মূলে কশ্যপনন্দন দুলে মনমথ মনমথ তায়।

মন মধুমক্ষিকা সাতমণ 'শব্দকল্পদ্রুম' পুঁথি চাপা পড়ল! মনের সঙ্গে বিযুক্ত শুধু কথার মার প্যাঁচ ইত্যাদি নিয়ে কতটা কৃত্রিম ভাবে গড়ে উঠল উপরের ছত্র কটায় তা দেখলাম। এরি সঙ্গে মনের সঙ্গে যুক্ত ভাষার একটা শব্দভেদী বাণ মিলিয়ে দেখ—'জিমুনা গো মুই জিমুনা,' 'রূপের পাথারে আঁখি ডুবি যে রহিল, যউবনের বনে মন হারাইয়া গেল। ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ, অন্তরে বিদারে হিয়া কি জানি করিল প্রাণ।' একেবারে ঘরওয়া কথা চলতি ভাষা কিন্তু কি সুতীব্র গতি পেয়েছে কবির মনের পরশ পেয়ে এ সব ছত্র! যদি এই ভাবে মনের হাতে পড়ে চলতি ভাষাও এত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে তবে কালীঘাটের পটের ভাষাকে চলতি বলে ছেড়ে ফেলে কেন যে সাতসমুদ্র তেরোনদী পারের ইতালীয়ান চিত্রের ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করতে যাব আমরা তা বুঝলাম না! জাপানের প্রসিদ্ধ চিত্রকর 'হকুসাই' কালীঘাটের পটুয়ার ভাষায় যে

সব চমৎকার চিত্র লিখে গেছেন আর্টিস্ট মাত্রেরই তা লোভের সামগ্রী! শুধু চিত্রাক্ষর জ্ঞান হলেই হয় না, বিচিত্র ভাষার দখল চাই। মনের হাতে সেই ভাষাকে চালাবার লাগাম দেওয়া চাই তুলে। যে ব্যক্তি পাথরের অক্ষর কাটতে শিখল সেই মিস্ত্রির কাজ আর যে কবি বা শিল্পী পাষাণের অক্ষরে রেখে গেল মনোভাবের ছাপ তাদের কাজের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত।

'বায়ু,' যাঁর রূপ নেই কিন্তু ধ্বনি আছে, পদ নেই গতি আছে, স্পর্শমাত্র ধরা দেন যিনি, তাঁকে নিরূপিত করে ধরা চিত্রে কি কাব্যে সহজ কৌশলীর কর্ম নয়! ঋষির ভাষায় বায়ুদেবতা কি রূপ পেলেন দেখ— 'রথের ন্যায় যে বায়ু বেগে ধাবিত হন তাঁহাকে আমি বর্ণন করি : বজ্র-ধ্বনির ন্যায় ইঁহার আরাব, ইনি বৃক্ষসমূহ ভগ্ন করিতে-করিতে আসেন, ইনি দিক-বিদিক রক্তবর্ণ করিতে-করিতে শূন্যপথে গমনাগমন করেন, ধরণীর ধূলি বিকীর্ণ করিতে-করিতে চলিয়া যান, পর্বতাদি যে কিছু স্থির পদার্থ তাহারা বায়ুর গতিবশে কম্পমান হইতে থাকে এবং ঘোটকীরা যেমন যুদ্ধে যায় তদ্রূপ এই বায়ুর প্রতি অভিগমন করে।'

'অমী ময়ূরাঃ শোভন্তে প্রনৃত্যন্ত স্ততস্ততঃ স্বৈঃ পক্ষৈঃ পবনো-দ্ধূতৈ র্গবাক্ষৈঃ স্ফটিকৈরিব'—চকিত কলাপী করে পক্ষ বিস্তার, স্ফটিকগবাক্ষ যেন মন্দ পবনে কাঁপে বার বার! এই ভাবে কবিবর বাল্মিকী বাতাসের রূপ দিলেন। কবিবর কালিদাস তিনি বায়ুচালিত মেঘের রূপ গড়লেন চমৎকারিণী ভাষার ছন্দে 'অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরিতপবনঃ কিং স্বিদিত্যু-ন্মুখীভিদৃষ্টোৎসাহশ্চকিত চকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ' ইত্যাদি। উড়িষ্যার মূর্তিকার পাথরের সূর্যাশ্ব গড়ে গেল, বৈদিক ঋষিদের বায়ু-বর্ণনা যেন পাথরে রূপ পেয়ে গেল—'ঘোটকীরা যেমন যুদ্ধে যায় তেমনি পর্বতাদি স্থির পদার্থ এই বায়ুর অভিমুখে ধাবিত হয়।'

সারথির মানস বল্গার মধ্যে দিয়ে ঘোড়াতে গিয়ে পেঁছায়, মনের সামান্য ইঙ্গিত তেমনি ভাষাতে গিয়ে পেঁছায়, চিত্রকার কাব্যকার সবারই কাজ থেকে এটা প্রমাণ হয়। মন আছে কিন্তু মনের ভাব গুছিয়ে প্রকাশ করবার ক্ষমতা সবার নেই এটা ঠিক। সাধারণ মন আর রসায়িত মন দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য ঢের।

মন! তুমি কি রঙ্গে আছ ভোলা মন রঙ্গে আছ, রঙ্গে আছ,
তোমার ক্ষণে-ক্ষণে ঘোরা-ফেরা দুঃখে রোদন সুখে নাচ!

Art interprets the mightier speech of Nature, it is a poetical language, for it is an utterance of the imagination addressed to the imagination and to rouse emotion.

বৈদিক ঋষিরা বাগ্‌দেবী সম্বন্ধে বলেছেন—'যিনি দর্শন করেন যিনি শ্রবণ করেন যিনি প্রাণধারণ করেন তিনি আমারই (বাণীর) সহায়-তাতে সেই সকল কার্য করেন... আমি (বাণী) দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট হইয়া আছি... আমি আকাশকে প্রসব করিয়াছি... সমুদ্রের জলের মধ্যে আমার স্থান, সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপনার উন্নত দেহ দ্বারায় এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি, আমিই তাবৎ ভুবন নির্মাণ করিতে-করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই, আমার মহিমা বৃহৎ হইয়া দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে!'

অতি পুরাকালে ইজিপ্ত দেশের ভাস্কর কঠিন প্রস্তরে যেসব বিশাল ও বিরাট সৌন্দর্যময় মূর্তি নির্মাণ করেছে তারই তুল্য এই স্তোত্রের ভাষা দিয়ে গড়া বাণী-মূর্তি! ভাষাশিল্পীর ভাষা কবিজনের, তাঁকে বিনা সাধনায় পায় না কেউ—'যজ্ঞোপযোগী উপকরণ সমূহের মধ্যে প্রথমা আমি (বাণী)... এতাদৃশা আমাকে (বাণীকে) দেবতারা নানা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, অপরিমেয় আমার (বাণীর) আশ্রয় স্থান!'

জগতে নির্বাক কিছু নেই একথা ঋষিদের মুখ থেকে শুনি আমরা: 'সোমরস নিপীড়ন করিতে-করিতে এই প্রস্তর সকল কথা কহুক, আমরাও কথা কহি; ইহারা (প্রস্তরেরা) কথা কহিতেছে, ইহাদের কথায় কথা কও... ইহারা শব্দ করিতেছে... ইহাদের শব্দে পৃথিবী ধ্বনিত হইতেছে ... ইহাদের শব্দ শুনিয়া জ্ঞান হয় যেন পক্ষীরা আকাশে কলরব করিতেছে, যেন ক্রীড়াভূমিতে ক্রীড়াসক্ত শিশুরা জননীকে ঠেলিয়া-ঠেলিয়া কোলাহল করিতেছে।'

······ ৪ ······

সুন্দরের সঙ্গে সম্পর্ক হল মনে ধরা নিয়ে আর অসুন্দরের সঙ্গে ঝগড়া রইল মনে না-ধরা নিয়ে। সুন্দরে অসুন্দরে সমদৃষ্টি শিশুর, চাঁদ থেকে মাটির ঢেলাটি পর্যন্ত তার কাছে সুন্দর, কিন্তু শিশুর জননীটির ভাব চাঁদের সঙ্গে, ঝগড়া ধুলো-বালির সঙ্গে, একটাকে তিনি ডাক দেন ঘরের মধ্যে আসতে—'চাঁদামামা আয় আয়' আর মাটির ঢেলাকে ঝাঁটিয়ে বিদায় করেন ঘর থেকে।

আমার নিজের চোখে অনন্যসাধারণ সুন্দর ঠেকল যা তা অন্যের কাছে অসাধারণ রকমের অসুন্দর যদি ঠেকে তবে দোষ দেব কাকে?

দক্ষিণ বারান্দার সামনে আকাশ-আলো-বাতাস আড়াল-করা ইমারত কটা সারি-সারি আড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার চোখের সামনে, মন বলছে আমার বিশ্রী-বিশ্রী-বিশ্রী এগুলো, কিন্তু ঐ বাড়ির মালিক এবং বাসাড়ে তারা ঐ বিরাট পায়রার খোপগুলোকে 'সুন্দর-ম্যান্‌সন্' নাম দিয়ে 'টু লেট্' নোটিস বড় করে ছাপিয়ে দিয়েছে দরজায়! অথচ ঐ বাড়িগুলোর আড়াল থেকে একটি খোলার বস্তি ও মাঠকোটা ভারি সুন্দর একখানি ছবির মতো পড়ছে চোখে। কাজেই সুন্দর অসুন্দর কথাটা ধাঁধার মতো লাগছে এবং বলতে হচ্ছে নিজের-নিজের চেহারা আয়নাতে যেমন আমরা দেখি সুন্দর, তেমনি নিজের-নিজের মনোদর্পণে নিজের মনোমতোকে যখন দেখি তখনই বলি সুন্দর।

সুন্দর সম্বন্ধে নানা মুনি নানা মত দিয়েছেন বটে, কিন্তু দেখি যে ঘটকের চোখে পাত্রী দেখে খুব কম ছেলেই চায় বিয়ে করতে! সাহিত্য-দর্পণ নিয়ে সাহিত্যিকের সব কাজ চলে না, সৌন্দর্যতত্ত্ব-বিশ্লেষক-দর্পণ নিয়ে শিল্পীর কাজ চলে না। 'কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট; খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট,' নেহাত খিল-ভাঙা কবাট না হলে ভাটের রূপ বর্ণন শুনে খুঙি পুঁথি হাতে কেউ বেরিয়ে পড়ে না সুন্দরী বৌ আনতে! সুন্দর বিচিত্র এবং সৌন্দর্যও বিচিত্র, তাকে নিয়ে প্রত্যেক মনের স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ঘরকন্না। সুতরাং ভাটের মুখে শোনার অপেক্ষা

নেই এখানে। পরের মুখের ঝাল কেন মিষ্টিও খাওয়া চলে না, নিজের মন-রসনায় চাখা ছাড়া উপায় নেই।

সুন্দরের রূপ ও লক্ষণাদি নিয়ে জনে-জনে মত ভেদ থেকে বোঝা যায় সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে শেষ কথা যদি কেউ বলতে পারে তো সে আমাদের নিজের মনই। বিশ্বরাজত্বে ছড়ানো সৌন্দর্যের তিল-তিল নিয়ে একটা তিলোত্তমা হাজির করেছেন এক সময় আমাদের দেশের শিল্পী ও কবিরা, কিন্তু রসিকের দল এই তিলোত্তমা গড়ার প্রথাকেই শুধু যে দোষ দিয়েছেন তা নয়, তাঁরা বলেছেন এ সুন্দর ছাড়াও অন্য সুন্দর আছে। শ্বেতপদ্মকে সুন্দর বলেছি বলে কালো কেষ্টকলি যে অসুন্দর তা তো বলতে পারলাম না!

'শুভ' আর 'অশুভ,' 'সু' আর 'কু,' 'সুন্দর' 'অসুন্দর' এই সব কথার সৃষ্টি হত না যদি না থাকত মনের দুরকম দৃষ্টি—মনে ধরানোর দৃষ্টি, মনে না-ধরানোর দৃষ্টি। এই দুই দৃষ্টি দিয়ে রূপের পরখ করেছি আমরা সবাই—আমার সুন্দরটি তোমার সুন্দর নয়, তোমার সুন্দরটি আমার সুন্দর নয়। নাপিতকে 'নরসুন্দর' বলা যায় 'কামালে জুমালে বর' তাও বলি! 'নরসুন্দর'-এ সৌন্দর্য সব সময়ে পাই না কিন্তু 'কামালে-জুমালে' মানুষটা যে পরিচ্ছন্ন দেখায় এবং 'নিকোলে-জুকোলে' ঘরখানি যে পরিপাটি দেখায় তাতে দুই মত নেই, সুতরাং পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা দুটো গুণ হল সুন্দরের মোটামুটি এই কথাই ধরে নেওয়া চলে বলে মনে করি। কিন্তু দেখি পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা এ দুটোর বিষয়েও এক মত পাই না খুঁজে। আমাদের দেশের পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা দেখে বিদেশের মানুষ মুচকে হাসে ও নাক সিঁটকায়। আমাদের দেশের শিল্পকারের উপদেশ হল—পরিপাটি করে মূর্তি গড়, পরিচ্ছন্ন করে পালিশ কর পাথরের দেবমূর্তি, কিন্তু খবরদার মানুষমূর্তি গড় না—নোংরা কাজ সেটা! গ্রীক শিল্পকার ঠিক এর উল্টো কথা বললে—মানুষগুলোকে করে তোলো দেবতার মতো সুন্দর। আবার চীনের শিল্পকার বললে—খবরদার দেবভাবাপন্ন মানুষকে গড় তো দৈহিক সৌন্দর্যকে একটু স্থান দিও না চিত্রে বা মূর্তিতে! নিগ্রোদের গড়া মূর্তি, যার আদর আর কাটতি খুব ইউরোপে, তার মধ্যে বেঢপ বেয়াড়া রূপই আশ্চর্য কৌশলে সুন্দর ভাবে দেখিয়েছে মানুষ। মন এই তেমাথা পথে ত্রিশঙ্কুতে পড়ে বলতে চায়—'মন বেচারার কি দোষ আছে।' নিজের মন ছাড়া যখন সুন্দর অসুন্দরের

আদর্শ কোথাও নেই, কোনো কালে নেই এবং ছিলও না, থাকবেও না এটা নিশ্চয়, তখন ও নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? বিচার বিতর্কে নিষ্পত্তি হল গিয়ে এক কথা। 'রসো বৈ সঃ'—তিনিই রস তিনিই সুন্দর, তাঁর সৃষ্টি হল সুন্দরে অসুন্দরে মিলিয়ে অপরূপ সুন্দর। সৌন্দর্যের পূর্ণ-চন্দ্র কুত্রাপি নাস্তি, পরিপূর্ণতা অপরিপূর্ণতা অস্তি!

এই যে প্রকৃতির অকাট্য নিয়ম, একে অতিক্রম করে পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতাকে পূর্ণতা দেওয়া এবং পরিপূর্ণ সুন্দরকে প্রত্যক্ষ রূপ দেওয়া কোনো আর্টিস্টের দ্বারা হয়নি এ পর্যন্ত, হবেও না কখনো। অপূর্ণ সৌন্দর্য আশা জাগাচ্ছে পূর্ণতার মানুষের মনে, এই পর্যন্ত হল মানুষের শিল্প কৌশল। সুন্দরের কল্পনা মনের বিচিত্র স্পর্শ পেয়ে নতুন-নতুন আলোকে ক্ষণিকের শিশিরবিন্দুর মতো শোভা ধরলে এই পর্যন্ত হল শিল্পীদের চেষ্টা, তার অধিক নয়। পরম সুন্দরের স্পৃহাই জেগে রইল শিল্পীর সকল চেষ্টায়—স্পৃহা মিটল না। এই অপূর্ণতাকেই দিলে রসের পরিপূর্ণ স্বাদ, যেমন অপূর্ণ চাঁদের ডৌল ও জ্যোৎস্না জাগায় পূর্ণ চন্দ্রিমার আশ!

চাঁদ একটুখানি চাঁচ্‌নী থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠার দিকে গেলেও যেমন তার গোলাকারের মধ্যে একটুখানি অপরিণতি থেকেই যায়, তেমনি মানুষে-গড়া সুন্দর কোথাও পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠে না। গ্রীস ভারত চীন ইজিপ্ত সব দেশের শিল্প পরম সুন্দরের পথে চলেছে, কিন্তু সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা পেতে চাওয়ার দিকেই চলল, লাভ করল না কেউ সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা। পরম সুন্দরের প্রতি টান বিচিত্র ছন্দে বিচিত্রতার মধ্যে দিয়ে অনুভব করছে শিল্পী-মানুষের মন, অথচ শিল্পী জানছেন নিজেই তিনি অপূর্ণ। চিরযৌবনের কল্পনা অম্লান ফুলের মালার পরিমল পাচ্ছেন তবু এইটুকুই হচ্ছে লাভ তাঁর।

পণ্ডিতেরা পরম সুন্দর সম্বন্ধে এবং সৌন্দর্য সম্বন্ধেও বেশ স্পষ্ট কথাই লিখে গেছেন, 'সৌন্দর্যতত্ত্বে' সে কথাগুলো পড়ে নেওয়া সহজ। কিন্তু সেসব তর্কজালের মধ্যে থেকে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করে বার করাই শক্ত! আর্টিস্ট তারা সুন্দরকে অসুন্দরকে নিয়ে চিরকাল খেলা করছে। নানা মূর্তিতে নানা চিত্রে নানা ছন্দে নানা নৃত্যে গানে তারা সুন্দরকে ধরে আনছে সভার সামনে কিন্তু সৌন্দর্য সম্বন্ধে বলতে গেলে সব আগেই আর্টিস্টের মুখ হয়ে যায় বন্ধ!

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, যাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আর্টের কোনোদিক এড়ায়নি তিনি বলেছেন সৌন্দর্য সম্বন্ধে—'পরম সুন্দর ও চমৎকার অসুন্দর দুইই দুর্লভ, পাঁচপাচিই প্রচুর এ জগতে।'

আমাদের দেশের শিল্পশাস্ত্রকারেরা বলেন—'পণ্ডিতে যাকে বলে সুন্দর তাই সুন্দর।' 'পণ্ডিতানাং মতম্' খুব জোরের সঙ্গে প্রচার করলেন তাঁরা, এর বিপরীত মত হল 'মনে লাগল তো মনোমত হল,' এ মতটাও বলেছেন তাঁরা কিন্তু ও-কথাটা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করেননি।

'তদ্ রম্যং যত্রনগ্নংহিযস্য হৃৎ' এই যে একটা মত চলেছিল প্রাচীন ভারতে শিল্পচিন্তার মধ্যে এটা খুব পাকা কথা; এতে করে সুন্দর অসুন্দরের কথাই ওঠে না শিল্পকার্যের বিচারের বেলায়। সুন্দরের অসুন্দরের জাত বিচার উঠিয়ে দিয়ে 'যার যাতে মজে মন তার কাছে তাই অনুপম' হতে পারে। কিন্তু একের আইন অন্যের কাছে তো খাটতে পারে না, সে বলে বসে—'কোথায় মজল মন? তোমার যাতে মজে মন আমায় তা যে বাজে সর্বক্ষণ!' ওরিয়েণ্টাল আর্ট আর অক্সিডেণ্টাল আর্টে কামড়া-কামড়ি বেধে যায়! তখন শ্রীচৈতন্যের কথা স্মরণ করে বলতে হয় 'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে, মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকি ত্বয়ি।'

মনে ধরা এবং মন টানার যুক্তি সুন্দর অসুন্দরের প্রভেদ স্পষ্ট করে বোঝাতে পারলে না। কাজেই বলতে হয় সুন্দর অসুন্দর দুইয়ে মিলে একটি অপূর্ব প্রহেলিকা সৃজন করেছে শিল্পরহস্য জানতে চলার গোড়াতে।

বিল্বমঙ্গল বারবনিতার রূপোন্মত্ততা থেকে বিভুর প্রেমোন্মাদে গিয়ে যে ঠেকলেন তাঁর মনটি সুন্দর ছিল বলে দৃষ্টি তাঁর রূপের কুহেলিকার গর্ভে প্রচ্ছন্ন স্বরূপে গিয়ে পেঁছিল। মন এখানেও দেখলাম সুন্দর অসুন্দর দুইয়ের পরীক্ষা করে বুঝে নেবার নিয়ন্তা। এখন শিল্পী ও কবি এবং সাধারণ মানুষ, তিনের মনে একই বস্তু সুন্দর কি অসুন্দর, নিরস কি সরস বলে লাগত তাহলে একটা মীমাংসায় পেঁছানো যেতে পারত কিন্তু তা হল না।

তুমি-আমি খরার দিনে বরফ-বরফ করছি আর বলছি—'দে জল দে জল দে রে বাপ,'—আর্টিস্ট এখন সোলাটুপি চাপিয়ে বারান্দায় বসে ছবি লিখলেন 'খরা দিনের দৃশ্যপট' :

কালবৈশাখী আগুন ঝরে, কালবৈশাখী রোদে পোড়ে,
গঙ্গা শুকু-শুকু আকাশে ছাই, পদ্মপত্রে জলবিন্দু নাই,
চাতক পক্ষীর গলা হল কাঠ, ডাকে ত্রাহি-ত্রাহি রোদে ফাটে মাঠ।

সুন্দরে অসুন্দরে মিলিয়ে দিলেন রসরূপটি পল্লী আর্টিস্ট, রসের প্রেরণা সুন্দর অসুন্দরের ধারণা একসঙ্গে গেঁথে কাঁটাফুলের পঞ্চরূপা মালা গেঁথে গেল।

অসুন্দরের মধ্যে থেকেও দুঃখের মধ্যে থেকেও মহাসুন্দরের রস আসে আর্টিস্টের কাছ থেকে, এই কারণে বলি আর্ট মাত্রেই সুন্দরের প্রকাশ দেখায়, অসুন্দরের বাহনে এলেন সুন্দর!

সুন্দর যা তাতে সহজে মন রত হয়, দলিল দস্তাবেজ দেখে বুঝে নিতে চলি না তাকে আমরা শিল্পীরা। অসুন্দরে সুন্দরে মিলিয়ে সুন্দর হল কাজটি এই বলি আমরা, এই দেখিও আমরা। যদি সত্যিই এই জগতে অসুন্দরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নিছক সুন্দর কোনো কিছু থাকত তবে এত তর্ক-বিতর্কের দরকার হত না উভয়কে চিনে নেবার বেলায়।

এমন পণ্ডিত নেই যে সুন্দরকে বিশ্লেষণ করে দেখবার ও দেখাবার চেষ্টা না করেছেন। সেই সব মতামতের একটা মোটামুটি হিসেব নিয়ে দেখি : (১) সুখদ হলেই বলি সুন্দর। (২) কাজের হলেই বলি সুন্দর। (৩) উদ্দেশ্য এবং উপায় দুইয়ের সংগতি হলেই বলি সুন্দর। (৪) সুশৃঙ্খলা হলেই বলি সুন্দর। (৫) সুসংহত হলেই বলি সুন্দর। (৬) বিচিত্র অবিচিত্র সম বিষম দুইয়ের মিলে হল সুন্দর।

কিন্তু সুন্দর বলেই সুন্দর—নানা ভাব ও নানা রূপের মধ্যে তার অধিষ্ঠান এটা বললে কথাটা সহজ হয়ে আসে এবং সুখদ-সুন্দর সুকৃত-সুন্দর প্রভৃতি নানা সুন্দরের হিসাব ফল দুটি সুন্দরে এসে ঠেকে, যথা : ভাব-সুন্দর ও রূপ-সুন্দর।

সুন্দরকে অসুন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখায় সুন্দরকে খণ্ডিত ভাবে খর্ব করে দেখা হয়। সুরূপ কুরূপ দুইয়ে মিলে অখণ্ড সুন্দর মূর্তির ধারণা করা সহজ নয়!

আর্টের দিক দিয়ে শৈশব কৈশোর যৌবনই সুন্দর, বার্ধক্য নয়, আলোই সুন্দর, অন্ধকার নয়, সুখই সুন্দর দুঃখ নয়, ভাদরের নদী সুন্দর, শরতের নদী নয়, শরতের চাঁদই সুন্দর হিমে ঢাকা শীতের চাঁদ

কিম্বা মেঘের আড়ালে চাঁদ সুন্দর নয়—একথা আর্টিস্টেরও নয় কবিরও নয়। 'ঐসা লো নহিঁ তৈসা লো নহি, মৈঁ কহি বিধি কথোঁ গম্ভীরা লো' (কবীর)। পরম সুন্দর তাঁকে 'বিছুড় নহিঁ মিলিহো'—বিচ্ছিন্ন ভাবে তিনি নেই! এই যে অখণ্ড সুন্দরের ধারণা লাভ করলেন কবীর সাহেব তার মূলে কি ভাবের সাধনা ছিল জানতে কৌতূহল হয়। সাধক নিজেই তা প্রকাশ করেছেন—'সংতো সহজ সমাধ ভলী... আঁখ না মূঁদূ, কান না রূংধূ, কায়া কষ্ট ন ধরূঁ, খুলে নয়ন মৈঁ হঁস-হঁস দেখূঁ সুন্দর রূপ নেহারূঁ'—সহজ সমাধিই ভালো, কেন চোখ কান বন্ধ রাখা কায়াকেই বা কষ্ট দেওয়া? হেসে চাও দেখবে সবই সুন্দর, যার মনে হাসি নেই তার চোখেও সুন্দর নেই!

সুন্দরের অসুন্দরের অবিচলিত আদর্শ চলায়মান জীবন কোনো-দিনই পায়নি, পাবেও না। যে দিক দিয়েই চলি সুন্দর অসুন্দরের সমস্যা মেটবার নয়। কাজেই সুন্দর অসুন্দরের মেলা দেখে যে তৃপ্ত হতে শেখে সেই হয় আর্টিস্ট, সুন্দরের দিকে চলার অশেষ রাস্তা খুলে যায় তার সামনে।

সুন্দর অসুন্দর জীবন-নদীর দুই টান, একে মেনে নিয়ে যে চলল সেই সুন্দর, আর যে এটা মেনে নিতে পারলে না সে রইল সৌন্দর্যতত্ত্বের খোঁটায় বাঁধা।

ঘাটের ধারে বাঁশের খোঁটা, তাকে অতিক্রম করে চলেছে জলের টান নানা ছন্দে এঁকে-বেঁকে, খোঁটাগুলো তার ধাক্কায় এদিক-ওদিক দোলে—বাঁধা নৌকোকে বলে বাঁধা থেক না আদর্শের খোঁটায়!

বাঁধা নৌকো সে এক ভাবে সুন্দর, ছাড়া নৌকো সে আর এক ভাবে সুন্দর। এই বিশ্বজগৎ সুন্দর অসুন্দরে মিলে বিচিত্র প্রকাশ বলেই ঠেকে আর্টিস্টের কাছে।

সৌন্দর্যের আদর্শের খোঁটা ভারি পলকা জিনিস। কালিদাসের আমলে সুন্দরীর আদর্শ ছিল 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা।' অজন্তার আদর্শ তার পূর্বের যুগের আদর্শ-সুন্দর থেকে তফাত হল। মোগলানী এসে সুন্দরীর আদর্শ উল্টে দিলে আর্টে এবং অবশেষে আরমানী এবং ফিরিঙ্গিনী। কোন দিন চীনা জাপানী আদর্শ সুন্দরী বা হাজির হয় দেখ!

আর্টিস্টের কাছে যা সুন্দর তার রূপটি হচ্ছে পরিপক্ক রসালের

সীমারেখাটির মতো সুডৌল। কিন্তু জ্যামিতির গোলটার মতো একেবারে বাঁধা-নিশ্চল গোলাকার নয়, সচল ঢলঢলে গোল যার একটু টোল আছে, পূর্ণ-চন্দ্রের মতো প্রায় পরিপূর্ণ কিন্তু সম্পূর্ণ নয়।

বাইরে রেখায়-রেখায় বর্ণে-বর্ণে, ভিতরে ভাবে-ভাবে এবং সব শেষে রূপে ও ভাবে সুসংগতি নিয়ে আর্টে সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করে।

সৌন্দর্যলোকের সিংহদ্বারের চাবি ভিতরের দিকে, নিজের ভিতরের দিক থেকে দ্বার খুলল তো বাইরের সৌন্দর্য এসে পৌঁছল মনোমন্দিরে।

সুন্দরকে অসুন্দরকে বোঝবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেক আর্টিস্টকে নিজে খুঁজে বার করতে হয়।

· · · · · ৫ · · · · ·

Nothing is so tiring as a constant close imitation of life, one comes back inevitably to imaginative work—Wiertz

আদিতম যুগ থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত মানবশিল্প মানব মনের এই দুই গতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। গুহায় বাস করছিল যখন আদিম মানব তখন দেখি গুহার দেয়ালে এবং টুকরো-টাকরা শিলাপটে চিত্র লিখেছে তারা ঠিক-ঠিক রূপ দিয়ে নানা জন্তু-জীব। রুই কাৎলা মাছ ভাসছে জলে, দুটো হরিণ জল খেতে এসেছে, একটা দেখছে সামনে একটা চাইছে পিছন বাগে! যেন শিকারীকে দেখছে বরাহ দৌড়েছে এই ভাবে, মহিষ শিঙ তাড়ছে এমনি কত কি সঠিক প্রতিরূপ চিত্রণ! সেই কালেরই কাদামাটিতে গড়া নানা পাত্র ও ভান্ড অদ্ভুত গঠনের, অপূর্ব সমস্ত রঙ-রেখার সমাবেশ নিয়ে অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে রচনা করা সমস্ত গৃহস্থালীর তৈজসপত্র। ভাব ও কল্পনার ছাপ পেয়েছে তারা আদিযুগের ভাবুক কারিগরের হাতে পড়ে।

এই যে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো শিল্পের বহির্মুখী আর অন্তর্মুখী গতি — শিল্পে দুই রীতির প্রবর্তন করলে। প্রতিরূপ শিল্প, প্রতিমাশিল্প, রূপক রূপকথা এবং শাদা কথা চলতি কথা ইত্যাদির নানা প্রথা প্রকরণ মতামত সৃষ্ট হল এই ভাবে বহুকালের বহু পরীক্ষার বহু দেশ-বিদেশে শিল্পের আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে।

মানুষ একদিকে গড়লে ঠিক টিয়াপাখি সঠিকের মত ধরে, আবার একদিকে গড়লে গরুড়পাখি বেঠিকের নিয়ম ধরে। কার্তিক ঠাকুর গড়লে ঠিক খোকাবাবুটি, গণেশ ঠাকুর গড়লে ধড়টি খোকার, মাথাটি হাতির। এই ভাবে দুই চালে চলল মানবশিল্প। এই দুই রকমের রচনা থেকে একটা কথা ধরা পড়ে যে শিল্পী-মানুষ শুধু ধ্যান ধরে চোখ বুজে গড়েনি, রূপ-জগৎ থেকে সে ধার করেছে, ভাবজগৎ থেকেও সে গ্রহণ করেছে।

শিল্পের ইতিহাস চর্চা করলে দেখি মানবশিল্পের যে দিকটা রসের রূপের সঙ্গে মেলাতে চলল, সেটা আকৃতিগত সাদৃশ্য মানতে বাধ্য না হয়ে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে ফুটে ওঠবার সুযোগ পেলে। এ যেন বীজ মাটি

থেকে রস পাবার সুযোগ পেয়ে নিজের আকৃতি পরিবর্তনের পথে চলল —বীজ ভেঙে বার হল অঙ্কুর, অঙ্কুর বদলে ক্রমে শাখা-প্রশাখার রূপে পরিণত হয়ে গুল্মাকার ছত্রাকার দীর্ঘাকার হ্রস্বাকার নানা আকারের গাছ-পাতা ফুল-ফল হতে চলল। এই ভাবে রসের বশে আকারের পরিবর্তন মানুষের কি জন্তু-জীবের কি নানা পত্র-পুষ্পের বাঁধা আকৃতির রূপ ভেঙে অপরূপতা দেওয়ার দিকে গেল। আবার এর উল্টো হল আকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, শুধু ডৌল মাত্র! তার নিজের শ্রীটুকুর উপরই হল রূপটির প্রতিষ্ঠা!

শিল্পশাস্ত্রকারেরা এই দুই রকম কাজ থেকে দুটো মত প্রচার করে বসলেন যখন এই দুই পথের মধ্যে কোন পথে চলবে শিল্পী-মানুষ তা নিয়ে বিতর্ক উঠল মনে। লোকমত যে-দেশে হল প্রবল প্রতিমাশিল্পের দিকে, সে-দেশে প্রতিমাই গড়তে চলল শিল্পীরা। যে-দেশে লোকমত প্রতিকৃতিশিল্পের দিকে ঝুঁকল সে-দেশে বসে গেল সব শিল্পী 'লাইফ্ লাইক্' মূর্তি দেবার পথে। আমাদের শিল্পশাস্ত্রে এ দুটো মতই স্থান পেয়েছে।

শিল্পশাস্ত্রকারেরা একদল একটা সময়ে মত প্রকাশ করলেন 'সলক্ষণং মর্ত্ত্যবিম্বং নহি শ্রেয়স্করং সদা'—দৃশ্যরূপের প্রতিকৃতি-অনুকৃতি প্রতিবিম্ব সমস্ত শুভকর নয়, শ্রেয়স্করও নয়। আবার এক সময়ে অন্য দল আর একটা মত ধরে বললেন 'শ্বাস মিব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণং'—হুবহু আকৃতির অনুকৃতি সমর্থন করলে এই মতটা। শিল্পরচনার রীতি দুই পদ্ধতি ধরে চলল বটে, কিন্তু আসলে শিল্পসাধনায় লোক পাকা হল প্রথম বাঁধারূপের প্রথা প্রকরণে এবং তারপর কল্পিত রূপ সমস্তের রচনাতে এমন ঘটনা ঘটেছিল আদিযুগের শিল্পীদের মধ্যে, এ কল্পনা করা ভুল। তাদের চেষ্টা এই দুই রীতি ধরেই চলল গোড়া থেকে—মনের ডৌলে বাঁধা মৃৎপাত্র তার উপরে নানা রেখা নানা বর্ণ দিয়ে নানা অলঙ্কারের নানা নক্সা—কতক নক্সা দেখি অনুকৃত, কতক নিজের কল্পিত রেখা রঙ ইত্যাদি দিয়ে, এই রূপই দেখা যায়। অবশ্য এখানে বলতে হবে যা কিছু মানস-কল্পনা মানুষের তা দৃষ্ট রূপের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিষ্ঠোতে পারে না। গরুড়ের কল্পনা খানিকটা দেখা-পাখির পাখা নিয়ে, ঠোঁট নিয়ে তবে প্রকাশ হতে পেল; নরসিংহ অবতার, রাবণরাজা, দেবী দশভূজা, গুহ, গজানন, সব কল্পনাই মানুষের দৃষ্টরূপের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে তবে বর্তালো শিল্পে। এ যেন রূপকে আশ্রয় করে অপরূপ কল্পনার প্রকাশ।

দেবী দাঁড়ালেন দুই পায়ে সাধারণ দৃষ্ট মানবীর মতো কিন্তু উপরের অংশ দেখা দিলে অদৃষ্টপূর্বরূপে—দশ হাতে দশ প্রহরণ নিয়ে দশভূজা! রাক্ষস মূর্তি রাবণ সেখানেও হাত বাড়াল বিশটা, মাথা বাড়াল দশটা, পা রইল সহজ মানুষের মতো দুটি মাত্র—সৃষ্টির নিয়ম মিলল অনাসৃষ্টি অনিয়মে! কুমার কার্তিক বাল-গোপাল—এখানে সৃষ্টরূপেই প্রতিচ্ছায়া দেখলাম, কিন্তু গণেশ ঠাকুরের বেলায় আর্টিস্ট ধরলেন অনাসৃষ্টির নিয়ম।

শিল্পে এমনি সব নানা রীতি-নীতি দেখে মনে হয় শিল্পশাস্ত্রের মতামতগুলির বড় একটা ধার ধারেনি এককালের শিল্পীরা। দুই রাস্তাতেই খেলে গেল তারা অঙ্কনের, গঠনের, বুনোনের গাঁথনের অপূর্ব কৌশল সমস্ত নিয়ে।

কল্পনাশূন্য একটা মানসিক অবস্থা নিয়ে মানুষ যে কয় যুগ কাটিয়েছিল সেটা গুটির মধ্যে গুটিপোকার অবস্থার সঙ্গে তুলনা করতে পারি; কিন্তু রূপজগতে যেদিন সে বিস্ময়-দৃষ্টিতে চাইলে সেদিন থেকে রূপের ও রসের সঙ্গে আড়ি ভাব দুই খেলাই খেলে চলল এই বলতে পারি। যে গড়ছে বা যে আঁকছে তার মনের সঙ্গে বিযুক্ত ছবি হল কলে তোলা ফোটো-যন্ত্রের দেখা ছবি। কেষ্টনগরের পুতুল রূপশিল্পের সব কটা নিয়ম মেনে চলল—রূপভেদ, প্রমাণ ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকা ভঙ্গ-এ্যানাটমি, পারস্পেক্টিভ, লাইট, সেড, ডেপথ্‌, স্পেস, মুভমেন্ট, প্রায় সব নিয়মই অকাট্য ভাবে মেনে চলার ফলে নির্ভুল পুতুল দিলে কিন্তু একটি গ্রীক মূর্তি বা ইজিপ্তশিল্পের বা ভারতশিল্পের মূর্তির যে রস ও সৌন্দর্য তা পৌঁছল না ওতে।

বাস্তব রূপের স্পর্শশূন্য নিছক কাল্পনিক রূপ একটা খুঁজি, কিন্তু কোথায় সেটা? হিজিবিজি? তাও দেখি পাখির বাসায়, চুলের ঘোরপ্যাঁচে, মেঘের প্রলেপে পাই। সত্যপীরের মাটির ঘোড়া দেখা-ঘোড়ার আকারের প্রকারটুকু ধরে আছে!

বাস্তব জগৎ থেকে অনেক দূরের কথা লিখলে কীর্তিবাস কবি:

গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবাকারোপর
লক্ষ্মীসহ তথায় বিরাজেন গদাধর।
তথায় অমৃতবৃক্ষ দেখিতে সুচারু
যে যা চায় তাহা পায় নাম কল্পতরু।

দেখা দেবতার, বৃক্ষের নির্মাণ এবং কার্যাদি রয়েছে এর মধ্যে। তারপর আবার বর্ণনা চলল : 'নিবাসিনি তথা রুদ্র দুর্গের প্রকাশ।' নিছক কল্পনার একটু শ্রেণী হতে-হতে বলছেন কবি—'তার মধ্যে আছে বিচিত্র আবাস' 'চারপাশে ক্রিয়াজাল উপরেতে চূড়া, বৃত্তাকারে বসিয়া আছেন অন্তরালী।' কল্পনার আকাশে বহুদূর উড়ে ঘুরতে-ফিরতে সুতোর বাঁধা কাগজের ঘুড়ি যেন নেমে এল বাস্তব জগতে কারিগর পুরো বাস্তুবিদ্যার হাতে। শাস্ত্রকারেরা মত দিলে কি হবে 'আদি জ্যোতিষ্কের মধ্যে দেবাদিদেবমহাদেব সকলকল্পনাসর্বাধিষ্ঠিত যদি জ্যোতিষ্কের সভা।' দেবাদিদেবের আদর্শ কল্পনা করা মর্ত্যবিম্বকে ছাড়িয়ে যখন, তখন এ অদ্ভুত প্রকারের মধ্যে শাস্ত্রকেরা নির্দিষ্ট মাপ পরিমাণ লক্ষণাদি দিয়ে যে সব দেবরূপ কল্পনা করলেন সেইগুলোই শিল্পীরা গড়ুক এই জোর হুকুম চালালো। এই হুকুমের সঙ্গে জোরজার যদি যোগ দিলে তো আর্টিস্ট নিজে অন্ধভাবে দেবতা গড়ার কাজে লাগালে আপনাকে এবং মতমাফিক ভাবে কাজ করে-করে চলল পুরুষানুক্রমে দেবতার গ্রামে গ্রামে। কচিৎ কোনো শিল্পী দেখা যায়, এই ভাবে থাকতে-থাকতে হঠাৎ নিজের কল্পনা মতো একটা হয়তো রূপ-মূর্তি গড়ে ফেললে যেটাতে তার নিজস্ব শিল্পজ্ঞান রসবোধ ইত্যাদির পরিচয় দিয়ে বর্তে রইল।

রীতিমাফিক ভাবে থাকায় পুরুষানুক্রমে দীর্ঘকাল একরূপ কাজ করতে-করতে এক-এক সময় মন বিদ্রোহ করেছে মানুষের, কি শাস্ত্রিকরূপে গড়বার কাজে, কি বৈদিক রূপকল্পনার কাজে; তখন সে নিজের অভিমত পথে অগ্রসর হয়ে জোর করে বলেছে—'অহং শাস্ত্রাতিক্রমণায়ুর'—হুলো যা চায় তাই গড়ি। তখন গড়েছে সেই আদিম শক্তি ফিরে পেয়ে ইচ্ছামতো রূপ সমস্ত।

কল্পনা ছাড়া বাস্তব, বাস্তব ছাড়া কল্পনা, কোনো আর্টিস্টের কাছে দেখা যায় না। একমাত্র সুরশিল্পী কল্পনাতীত এবং বাস্তব-জগতের অতীত রূপ সমস্ত ধ্বনির সাহায্যে নির্মাণ করতে পারেন; বাস্তব-জগতের বায়ুতরঙ্গে ঢেউ তুলে পৌঁছায় শ্রুতিমধুর রূপে এবং শ্রুতির সাহায্যে মনে গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু এরও মধ্যে মত রয়েছে—হনুমন্ত মত, ভরত মত, নারদ মত, কত কি!

শিল্পশাস্ত্র যদি ঘাঁটতেই হয় তবে মত আর মন্ত্র এই দুটোর পার্থক্য কোথা আগে বুঝে চলতে হবে আমাদের। মত অপেক্ষা রাখে সমর্থনের,

মন্ত্র তা নয়, কেননা মন্ত্র সমস্ত মতের শক্ত পরীক্ষিত প্রচারক ও সহায়ণীয়।

ধর্মে যেমন, তেমন শিল্পকলাতেও মানুষ মতও চালিয়েছে মন্ত্রও চালিয়েছে, নানা মুনির নানা মত! শিল্পের মন্ত্রকথাগুলো কি একালে, কি সেই আদিকালে, সমভাবে কাজ করল। মত কিন্তু বারে-বারে খণ্ডিত হল!

মন্ত্রগুলো দেয় শিল্পীতে-শিল্পীতে শিল্পে-শিল্পে যোগ অবিচ্ছেদ্য তারাই থাকল। মতগুলো দেয় ভেদের খবর!

শিল্পশাস্ত্রে মত ও মন্ত্র দুটোরই স্থান আছে সুতরাং শিল্পশাস্ত্র-গুলো থেকে শিল্পের কোনখানের বিষয়ে আলোচনা করতে পারি আমরা। মত-গুলো জানায় বিভিন্ন মতবাদের অবস্থায় শিল্প কখন কি মূর্তি ধরলে, কি প্রণালীতেই রচিত হল মূর্তি চিত্র ইত্যাদি এমনি নানা কথা। আর মন্ত্রগুলো জানায় শিল্পসাধনার রসসাধনার পন্থার উদ্দেশ, যা দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বদলায় না এমন সব শিল্পের বিষয়ে নিগূঢ় সত্য ও তথ্য।

রসশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র এই সব মত ও মন্ত্রগুলির সম্বন্ধে নানা দৃষ্টিতর্ক ইত্যাদি নিয়ে নানা দিক থেকে শিল্পজ্ঞান রসবোধ ইত্যাদির বিষয়ে শিল্পচর্চার সহায়তাই করে থাকে যদি আমরা মত ও মন্ত্রের যথাযথ বিভাগ ধরে কাজ করি।

আমাদের দেশে মত দেওয়া যেমন সুলভ মত আঁকড়ে চলাও তেমনি সাধারণ ঘটনা। কে ছিলেন কি বা ছিল এ সম্বন্ধে মত প্রচারিত হয়েছে কষ্টিপাথরের মতো যা শক্ত! কিন্তু শিল্পরচনা সমস্ত হল শিল্পীর অভিমত ধরে চলার প্রকাশ। শিল্পশাস্ত্রকারদের জোর মত নিয়ে শিল্পীর মনোমত গড়নাদির বিচার করতে বসলে ঠকে পড়তে হয়, মতের ফাঁকিতে ঠেকতে হয়!

শিল্পের মন্ত্র ধরে চলায় সে বিপদ নেই। বৌদ্ধযুগ থেকে মোগল এবং বৃটিশ আমল পর্যন্ত শিল্পীকে তার শিল্প নিয়ে নানা মতের নানা মতো পথে চলতে হয়েছে। বৌদ্ধযুগেই দেখি গ্রীক মত পারসীক মত এবং ভারতীয় মত—তিন মতের চাপনে তিন মতো লক্ষণ প্রকাশ করলে বৌদ্ধশিল্প চৈত্য বিহার ইত্যাদির ভিত্তি চিত্র ও ভাস্কর্যে! মোগল আমলে পারসীক এবং ভারতীয় এই দুই মতের সংঘাত, বৃটিশ আমলে ইউরোপীয় মতের প্রাদুর্ভাব। এর মধ্যে-মধ্যে মতবিরুদ্ধ শিল্পের নমুনাও

পাই অল্পসল্প যার উপরে দেখি শিল্প-মন্ত্রগুলো কাজ করছে এবং সেই-সেই নমুনা থেকেই ভারতশিল্পের সত্যরূপটি প্রকাশ পায় দ্রষ্টার কাছে।

মন্ত্রগুলো চিক্কণ কষ্টিপাথরের মতো পিচ্ছল কালো। চলতে বিপদ সে পথে পদে-পদে। আরম্ভ তার অন্ধকার শেষও তার অন্ধকার। মন্ত্র সকল সূর্যের মতো দীপ্যমান। তার আলোকে শিল্পের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, কি কল্পনারাজ্যের বস্তু কি বাস্তবরাজ্যের কল্পিত, সমস্তই পরিষ্কার ভাবে চোখে পড়ে।

'নিয়তিকৃতনিয়ম রহিতাং হ্লাদৈকময়ীং অনন্যপরতন্ত্রাং নবরস রুচিরাং নির্মিতিম্ আদধতী ভারতী কবের্জয়তি'—'নিয়তিকৃত নিয়ম-রহিতা, আনন্দের সঙ্গে একীভূতা, অনন্য পরতন্ত্রা নবরসরুচিরা নির্মিতি-ধারিণী যে কবি ভারতী তার জয়,' এই যে বাক্য এ শুধু কথার কথা নয়, কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য, সব দেশের সব শিল্পের পূজারীর জন্য এই মন্ত্রপূত পঞ্চপ্রদীপ; মতের ফুৎকারে এ কোনোদিন নেভবার নয়, কেননা রসের সত্য মন্ত্র এটি!

'কবয়ো নিরঙ্কুশাঃ' কাব্যশাস্ত্রের ছন্দশাস্ত্রের বাঁধাবাঁধি বাড়াবাড়ি খোঁচা-খুঁচি থেকে ছাড়া পেয়ে স্বাধীন ভাবে কবির মন যথাসুখে রচনা করে যেতে পারবে, আর ছবি মূর্তি ইত্যাদির রচয়িতা তারা আটকা থাকবে রূপেরই রাজত্বে, বাস্তবতার শিলমোহর-আঁটা কুঁজার মধ্যে আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মতো অশক্ত অবস্থায় কূপমণ্ডূকবৎ ছোট জগতে বন্ধ, ছবি থাকবে ফোটোকলের বাক্সতে-ধরা, মূর্তি থাকবে মডেলিং-টুলে পাথাটানা কুলির মতো, এ কোন দেশী কথা!

ইউরোপীয় আর্টিস্ট বললেন :

> One of the hardest things to determine is how muoh realism is allowable to any particular picture.
>
> —*Burne Jones*

রসরচনায় বাস্তবতার চাপ কতখানি সয় না সয় এর মীমাংসা রচয়িতার উপরে ছাড়াই ভালো।

পাকা ড্রয়িং হল তো চিত্রও সুন্দর হল এ কথা বললেন না আর্টিস্ট—

It is a false idea that drawing in itself can be beautiful. It is only beautiful through the truths and feeling it translates.—*Rodin*

'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—রস থাকল তো হল ঠিক মূর্তি, ঠিক চিত্র, একথাও বলা চলল কেননা ছবি মূর্তি ইত্যাদির দ্বারায় শিল্পীর মনোভাব বাচিত হচ্ছে, নৃত্যকলার ভঙ্গীতে বাচিত হচ্ছে নর্তকের ভাব, সঙ্গীত-কলায় সুরে বাচিত হচ্ছে গায়কের মানস।

ফোটোযন্ত্রের রূপ ধরবার রূপের গতি ভাব-ভঙ্গী এমন কি আজ-কালের টকি কলের সাহায্যে রূপবান-রূপসী নট-নটীদের কথা সুর-সার সমস্ত ধরবার ক্ষমতা হয়ে চুকেছে, কিন্তু চিত্রবিদ বলাতে পারছে না তো ফোটোযন্ত্র আপনাকে!

কে চিত্রবিদ? এর উত্তর কবীর সাহেব দিলেন : 'জিন য়হ চিত্র বনাইয়া সাঁচা সূত্রধারী কহহী কবীর তে জন ভলে চিত্রবংত লেহিবিচারি'—যিনি এই জগৎচিত্রের রচয়িতা তিনি সত্য সূত্রধার, সেই জন শ্রেষ্ঠ যে চিত্রের সহিত চিত্রকারকেও লইল বিচার করিয়া। ফোটোগ্রাফারের কৌশল বাহিরে-বাহিরে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর যোগের কল-কৌশল। শিল্পীর কৌশল বস্তু-রূপের সঙ্গে রসের পথ ধরে অন্তর-বাহিরে যোগ।

স্থান-কাল-পাত্র এদের বিজ্ঞাপন দেওয়াই শুধু তো শিল্পীর কাজ নয়, যথাযথ রূপটার প্রতিবিম্ব দিয়ে চলা মানে রসকলাকে ফোটো-চিত্র-কলার বিজ্ঞাপনের কোঠায় নিয়ে বন্ধ করা, সুর ছেড়ে হরবোলার বুলি বলতে ধরা।

শিল্পীমানুষের শিল্প তার মনের পাখির গতিবিধির চিহ্ন রেখে গেল কালে-কালে পাথরে কাগজে মাটিতে সোনায় কাঁসায় কাঠে কাপড়ে সুর-সারে কথায়-বার্তায়। এই সমস্ত শিল্প অরূপের রসের বার্তা সমস্ত পৌঁছে দিলে দর্শকের মনে তবেই তো হল কাজ।

To make a thing which is obviously stone wood or glass speak is a greater triumph than to produce wax-works or peepshows.—*Rodin*

রূপমুক্তির সাধক হল আর্টিস্ট। কল্পনা ও স্মৃতি এই দুই টানা-পোড়েনে বুনে চলল যেন বিশ্বজোড়া যবনিকাখানি রূপ-অরূপের মিলন চিত্র লেখা! অগোচর রূপসাগর—তার জল ছুঁয়ে এল শিল্পী-মানুষ, হাতের পরশে তার ফুটল তখন বিচিত্র চিত্র, বিচিত্র শিল্পরচনা।

বিদ্যমান রূপ, অবিদ্যমান রূপ ও রস কল্পনা, এই দুই ডানার ওঠা-পড়ার চিহ্ন ধরে চলেছে মানুষের মন-কল্পিত তাবৎ রচনাই। রূপের ডালিতে রসের নৈবেদ্য ধরে দিলেন শিল্পী! চিহ্নবর্জিত অরূপ তাকে পাথরের রেখায় রঙের টানে সুরের মীড়ে কত-কি-তে চিহ্নিত করে গেল শিল্পী মানুষ তারা!

> Art has been pursuing the chimera attempting to reconcile two opposites, the most slavish fidelity to nature and the most absolute independence, so absolute that the work may claim to be a creation.
>
> —*Braquemont*

শিল্পীর অনুসন্ধিৎসা শুধু দৃষ্টরূপে বাহিরটাতেই ঠেকে ফিরে এল না, তাদের অন্তরের গোপন রহস্য ভেদ করতে চলল। অগোচরের অবাস্তবের অসম্ভবের অজানার সঙ্গে দৃষ্টি বদল করার দুর্নিবার ইচ্ছা সমস্ত শিল্পীর সাধন-পথের সাথী হয়ে রইল। শিল্পের এই যে রহস্য একে যখন কোনো প্রতিভাবান শিল্পী রূপমুক্তির সাধনা দিয়ে ধরেছে তখনই রস-সৃষ্টির অধিকারী হয়েছে, এমন ঘটনা মানবশিল্পীর জীবন-ইতিহাসে বিরল হলেও, ঘটেনি যে কালে-কালে তা নয়!

সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সৃষ্টির দিকে অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি, এই হল আর্টিস্টের ভাবুকের রূপসাধনার প্রথা প্রকরণ। চোখ বুজে ধ্যান নয়, স্বপন দেখা নয়, দৃষ্টিসাধনায় বলীয়ান শিল্পী রূপরাজ্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করে সন্ধানে চলে গেল অরূপের, যেখানে রূপেরই প্রদীপ রূপের ঢাকনের মধ্যে জ্বলছে। সেখান থেকে নতুনতর দেখা নতুনতর শোনার খবর এনে পেঁছলেন শিল্পী যখন, তখনই ঠিক ভাবে পেলাম রূপের পাত্রে রূপাতীত রস—চিত্রে আলোর আর কালোর ছন্দ দুলিয়ে দিলে প্রাণ, সংগীতে সুর মিলল সুরাতীতের রেশটুকুতে, নর্তক দেখিয়ে

গেল চলার পথ কোন সে অগম্য দেশে যুগল তারার কাছে গিয়ে ঠেকেছে! রূপসাধনা থেকে রূপমুক্তির সাধনা পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথ হল শিল্পীর সিদ্ধিলাভের পথ, নান্য পন্থাঃ!

আদি কালে শিল্প সমস্ত মানুষের ঘরকন্নার নানা তৈজসপত্র হাড়মালা লোহার বালা পশুরোমের কম্বল আসন ইত্যাদি এবং মৃগয়ার ও যুদ্ধের ধনুক-বাণ গদা-কুঠার ফাঁদ-ফাঁস ইত্যাদি নানা প্রহরণ যোগালে। সেই গুহা-বাসী অবস্থা কাটিয়ে মানুষ যখন গ্রামবাসী হল তখন বস্ত্রবয়নের কল-কৌশল, [illegible] কল-কৌশল, ঘর বাঁধার কল-কৌশল, এমনি নানা কল-কৌশল দখলের সঙ্গে মানুষের [illegible]দেবতা, হলেন তিনি গ্রামদেবতা। ঘরের জিনিস নির্মাণের কাজ আবার গ্রামের ঠাকুর-তুষ্টির নানা উপকরণ শিল্পীদের করতে হল।

এমনি একখানা গ্রামে এক ঠাকুর, দশখানা গ্রামে দশ ঠাকুর, শেষে রাজা দাশরথির সঙ্গে নগরবাসী তারাও দাবী দিলে শিল্পীর রচনা সমস্তের উপর। ব্যাপারীরা বার হল গ্রাম থেকে নগরে, নগর থেকে দেশ-বিদেশে সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে। শিল্পের কারবারে আদান-প্রদান চলল এ-দেশের শিল্পে ও-দেশের শিল্পে।

মানব ইতিহাস চর্চায় দেখা যায় যে শিল্পী প্রধানত যোগাচ্ছে দেবতার ভোগের বস্তু আর রাজার ভোগের বস্তু এবং সেই সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে মানব-শিল্পকলার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য। ঘরামির কাজও রইল, আবার প্রাসাদাদি নির্মাণ, রাজপথ প্রস্তুত, শহর বসানো, কুয়ো খোঁড়া, মন্দির প্রতিমা রথাদি নির্মাণ, এমনি নানা শিল্পকাজ ও সেই-সেই কাজ করার প্রথা-প্রকরণ দখল হল মানুষের এবং সেই সব অধ্যায়ে-অধ্যায়ে বিভক্ত হয়ে শিল্পশাস্ত্র, নাট্য-শাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র, প্রতিমা-লক্ষণ, পুজা-পদ্ধতি ইত্যাদি নানা কাণ্ডে নানা বিদ্যায় পুঁথিগত হয়ে রইল।

সেই সব প্রাচীন শিল্পাদি নানা শাস্ত্রের সার সংগ্রহ কতক-কতক রাজ-রাজড়ার পুস্তকাগারে, দেবমন্দিরের কুলুঙ্গিতে, ও কীটদষ্ট অবস্থায় কোনো-কোনো শিল্পীর গৃহদেবতার পিঁড়ার তলায় পাওয়া যাচ্ছে। সে সমস্ত থেকে দেখা যায় রাজভোগের উপযোগী শিল্পসামগ্রীতে আর দেবতার ভোগের সামগ্রীগুলিতে যান-বাহন অসন-বসনাদি বিষয়ে বড়

একটা তফাত নেই। যা রাজভোগে লাগে দেবতার ভোগেও তা আসে, একটু তফাত নেই দুই প্রস্থ শিল্পসামগ্রীর মধ্যে।

এ তো গেল পূর্বকালের ভারতশিল্পের অবস্থার কথা, এখন এই আমাদের কালে শিল্পের হালচাল একটু দেখা যাক।

হালে আমাদের প্রাচীন শিল্প কিছু-কিছু দেবতার ভোগে আসছে কিন্তু ধনবান ও রাজা-রাজড়া এমন কি গৃহস্থবাড়িতেও প্রাচীন শিল্প-সামগ্রীর স্থান নেই! এ কয় স্থানে নতুন ইলেকট্রিক প্রদীপের ও আমদানি-করা এনামেলের তৈজসপত্রের কাটতি বেড়ে গেছে। এতে করে যে সমস্ত চমৎকার শিল্পের উদ্ভাবনা হচ্ছিল এককালে তার রাস্তা বন্ধ এবং পিতা থেকে পুত্র এই ভাবে বংশপরম্পরাগত ভাবে শিল্পসামগ্রীর সব নির্মাণ-কৌশল প্রথা-প্রকরণাদি জ্ঞানের দখল করার উপায়ও বন্ধ হচ্ছে দিনে-দিনে; এবং কতক শিল্পরহস্য নিয়ে শিল্পীর দলও ঝাড়ে বংশলোপ পেয়ে গেছে। এখন শুধু শিল্পশাস্ত্রের উপর নির্ভর। শিল্পকে জানার বেলায় কারিগরের উপদেশ ক্রমেই দুর্লভ হয়েছে।

এই অবস্থায় শিল্পশাস্ত্রগুলো কি ভাবে কাজে আসে আমাদের তা দেখা কর্তব্য।

দেখা যায় প্রতিমা-লক্ষণ প্রাসাদ-নির্মাণ ইত্যাদি নানা বিষয় রয়েছে শিল্পশাস্ত্রে কিন্তু বিশেষ-বিশেষ শিল্পের বিশেষ-বিশেষ সামগ্রীগুলি প্রস্তুতের প্রকরণাদির কথা শিল্পশাস্ত্রের মধ্যে পাই না, সে সব কলা-কৌশলের রহস্য অলিখিত অবস্থায় রয়ে গেছে।

নানা গন্ধতৈল নানা মূল্যবান ব্যবহারিক-শিল্প—ফুলদান থেকে আরম্ভ করে ফুলকারি কাপড় পর্যন্ত এমনি নানা বস্তুর গঠন ও প্রস্তুত-করণের প্রকরণ ক্বচিৎ ধরা গেল শিল্পশাস্ত্রে। এ ভাবের পুস্তক খুব কমই রচিত হল দেশে। প্রক্রিয়া সমস্ত যারা শিল্পক্রিয়া করে চলেছে তাদেরই জানা কিম্বা না-জানার উপরে ছাড়া রয়ে গেল। শিল্পী গেল মরে, লোপ পেল তার সঙ্গে একটা শিল্প-কৌশল, কতক কাজের কৌশল গেল ভুলে শিল্পী পেটের দায়ে চাকরিতে ঢুকে। এই ঘটনা ক্রমে ঘটতে-ঘটতে শেষে দাঁড়াবে এমন অবস্থা যে প্রাচীন শিল্প বলে কথাটাই থাকবে না আমাদের অভিধানে!

বিচিত্র শিল্পের নানা আদর্শ বর্তে থাকল দেশে কিন্তু তাদের নির্মাণের কৌশল, পালিশের প্রক্রিয়া জানলাম না। শুধু মুগ্ধ হলাম বস্তুগুলো

দেখে আর বললাম বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে—এ সব বিশ্বকর্মার সৃষ্টি!

শিল্পশাস্ত্রগুলি যে ভাবে রচিত হয়েছে তাতে তারা কিছু-কিছু শিল্পের পুরাতত্ত্ব জানার বিষয়ে কাজে আসতে পারে। শিল্পের প্রাচীন-কালের নিদর্শন সমস্ত দেখে আমরা এত-হাজার অত-হাজার বছর আগে কত বড় স্থানই অধিকার করেছিলাম শিল্পজগতে এইরূপ একটা ভুয়ো গর্ব জাগাবার কাজে আসবে, কিন্তু শিল্প-কৌশলের জ্ঞান শিল্পী ছাড়া কারু কাছে পাব না আমরা। বিশেষ শিল্পকর্মে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্যে ইউরোপে নানা পুস্তিকা বার হয়ে থাকে, সে-ধরনের পুঁথি এদেশে নেই। বিশেষ শিল্পের বিশেষ দক্ষতা যার, সেই কারিগরদের কাছে সেই-সেই শিল্পের কৌশলাদি শেখা ছাড়া উপায় নাস্তি। শিল্পশাস্ত্র যে কয়খানা আমাদের রয়েছে তাতে ভাস্কর্যের খানিক, স্থাপত্যের খানিক, এমনি যান-বাহনাদির খানিক নিয়ে জোর শাসন লক্ষণাদি নিয়ে একটা-একটা নামেই শিল্পশাস্ত্র, শিল্পীর পক্ষে কিম্বা শিল্প-শিক্ষার্থীর পক্ষে কাজের নয় এমন কতকগুলো অনুশাসন আইন-কানুন নিয়ে সেগুলি রচিত হল!

আর্টকে আর্ট হিসেবে দেখা, 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক' এই ভাবে শিল্পরসের দিক দিয়ে শিল্প-বিচার পূর্বকালে আমাদের আলঙ্কারিক-গণ করে গেছেন, সেই সব বিচার-বিতর্ক নিয়ে রসশাস্ত্র গড়ে উঠেছে কালে-কালে। নানা কলার রহস্য সেগুলি থেকে পাওয়া যায়। শুধু কাব্যকলার সঙ্গে রসশাস্ত্র অলঙ্কারশাস্ত্র এদের জড়িয়ে রাখলে তত ফল পাই না আমরা যতটা পাই চিত্র ভাস্কর্য ইত্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে অলঙ্কারের সূত্রগুলো পাঠ করলে। এখন ধর একটি আর্টস্কুলের বা কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা শাস্ত্রচর্চায় বুদ্ধি পাকালে এবং এ-মন্দির, সে-মন্দির থেকে নানা শিল্পকার্যের নমুনা সমস্ত দেখে কাজে লাগল আর্ট রিভাইভ্যাল-এর কাজে—দেশীয় শিল্প-পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায়, তবে দেখব তাদের কতক-কতক দেবে পড়া-বিদ্যা আর নকলনবিসীর ফল—যা ঘটেছিল ইউরোপে গ্রীকমূর্তির ছাঁচ দেখে ইতালীয় ছবির নকল নিয়ে চলায় এবং যা ঘটছে আজকের দিনে এদেশেও আর্ট রিভাইভ্যাল-এর নামে, এবং হচ্ছে কালোয়াতি গান শিখে সঙ্গীত-উদ্ধারের, হেথা-হোথার নাচের ছাঁদ দিয়ে নৃত্যবাসর সমস্তে, এমন কি সাহিত্যেও। সাতনকলে আসল-ভেস্তা শিল্প পেয়ে কোনো লাভ আছে কারু! সপ্ত সর্গ সাত কাণ্ড

অষ্টাদশ পর্ব এরই ছাঁচের মধ্যে কাব্য গড়লেই সেটা মহাকাব্য যে হয় না তা বহুবার প্রমাণ হয়েছে বঙ্গসাহিত্যে। আর্টস্কুলের স্বল্পশিক্ষিত অজন্তা ও কালীঘাটের পট পুনরুজ্জীবিতের ব্যর্থ চেষ্টায় কি ভোগ না ভোগাচ্ছে এবং নিজেরাও ভুগছে। ও-দেশের শিল্পশাস্ত্র পড়তে ঘামাচ্ছে মাথা, রসশাস্ত্র পড়তে হারাচ্ছে সহজ বুদ্ধি ও কারিগরী; এমন কি ইউরোপ-ফেরতা দেশীয় আর্টিস্টের দল, নটের দল, নটীর দল, চিত্রকরের দল, ভাস্করের দল কেউ পাঁকাটি, কেউ কণ্ডাক্টারস্ রড্, কেউ সোনার কলম, সোনার তুলি ছুঁইয়ে চাচ্ছেন ঘুমন্ত শিল্পকুমারীকে জাগাতে, কিন্তু বেচারা ঘুমিয়েই গেছে দেখছে।

পড়া-বিদ্যার কারদানি দেখে-দেখে নকল-নেওয়া নতুন শিল্পের উদ্ভাবনা কাজে খুব কমই আসে। অবশ্য পুরাতন শিল্পের ফ্যাশান বাজারে চালাবার সময় কাজে দেয় যথেষ্ট। চীনদেশের প্রাচীন শিল্পের মূল আদর্শ ও ধারা সহজলভ্য নয়। প্রাচীন শিল্পের নকলনবিস শত-শত আছে সেখানে, শুনেছি যাদের পেশাই হচ্ছে প্রাচীনকালের ছবি মূর্তি সমস্ত হুবহু নকল করা।

কি প্রাচীন শিল্প কি শিল্পশাস্ত্র রসশাস্ত্র এসবের সঙ্গে আংশীক-ভাবে যোগ হলেই যে নতুন করে শিল্পকে পাব এমন কোনো কথা নেই।

কবি হয় মানুষ কেমন করে তা লেখা আছে 'কাব্যপ্রকাশের' দু-ছত্র শ্লোকে!

শিল্পকর্মে দক্ষতা পড়া-বিদ্যার দ্বারায় তো হয় না, হাতে-কলমে কাজ ও নানা প্রকরণের অভ্যাস ইত্যাদি নানা কিছু দখল করা চাই তবেই পাই শিল্পকে।

ছেলে-খেলার পুতুল গড়ার কোনো শাস্ত্র নেই অথচ তার অনেক পুতুলই মেদিচীর ভিনাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে আর্টের কৌশল ও সৌন্দর্যের দিক থেকে, এ-কথা জোর করে বলে এত বড় উদার-দৃষ্টি কোনো আর্ট সমালোচকের নেই। কিন্তু এটা সত্যি যে বয়স্কের দৃষ্টি-ভোলানো সৃষ্টি রচনার চেয়ে শিশুর মন-ভোলানো খেলনা গড়া যে সহজ তা নয়।

সেকালেই শাস্ত্রের নিয়ম ধরে চলায় যে সব ঠেকা পরে-পরে এসেছিল, একালেও যদি প্রাচীন পন্থায় শিল্পশাস্ত্র ধরে চলি তবে সেই কালের আর্টের সঙ্গে সেই সব কালের বাধাবিঘ্নগুলোর পুনরাবৃত্তি হবে।

অনেকে বলবেন না হয় পুনরাবৃত্তি হলই, আগের মতো শিল্প-গৌরব লাভ করি তো মন্দই বা কি? নকল নিয়ে গৌরব শিল্পরাজত্বে নেই, আসলের আদরই আছে সেখানে। ছোট ছেলে ঠাকুরদাদার নকল দেখাতে এলে হয় দাবাড় খায় নয় তো হাসি জাগায়। পুরাকালে যাঁরা শিল্পী ও শিল্পরসিক ছিলেন তাঁরা নিয়ম করতেন নিয়ম ভাঙতেনও, কেননা সেকালে শিল্পও ছিল শিল্পীও ছিল। এখন আমাদের সেই সেকালের শিল্পের সমতুল্য কিছু গড়বার বল থাকত তো আগাছার মতো সেকালের রস নিয়ে বাতাসে শিকড় মেলিয়ে মাথা নিচু করে ঝুলে থাকতাম না।

অতীতের শিল্পসম্পদ হারিয়ে বসা আমাদের শিল্পের পক্ষে দুর্ঘটনা, কিন্তু শুধু তাই রইল, একালের অর্জিত কিছুই রইল না, এটা শিল্পের বাঁচার পক্ষে অনুকূল অবস্থা মোটেই নয়। গাছের আগডালে যে নতুন মুকুল গাছের গোড়ায় অতীতের অন্ধকারে গাছের বীজটির প্রাণের স্রোতের সঙ্গে যুক্ত থেকে নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে যে ভাবে মিলছে সেইরূপ মেলাই হল ঠিক। অতীত শিল্পের সঙ্গে বর্তমান শিল্পের নতুন প্রকাশের এই হল স্বাভাবিক যোগ।

বৌদ্ধযুগে আমাদের শিল্প বোধিবৃক্ষের কলমের চারা ও ধর্মশাস্ত্র শিল্পশাস্ত্রাদির সঙ্গে সোনার গামলায় নীত হয়েছিল এ-দেশ থেকে সে-দেশে কিন্তু সেখানে গিয়ে প্রাচীন ভারতশিল্প নবীন আবহাওয়ায় দেখতে-দেখতে নতুন তেজে বেড়ে উঠল, ঔপনিবেশিক এক-একটা নতুন ধাঁচ পেলে দেবমূর্তি প্রাসাদ ইত্যাদি-ইত্যাদি সমস্তই, কিন্তু নিজ ভারতে শিল্পশাস্ত্রের মতের বাঁধনে বাঁধা শিল্প বাঁধানো বোধিদ্রুমের সঙ্গে দীনাবস্থা প্রাপ্ত হতেই চলল।

সেকালের শিল্পীদের পথ ধরে ক্রিয়া করে এখনো আমরা শিল্প-বিস্তারের আশা করতে পারি, কিন্তু একালকে বাদ দিয়ে সে ক্রিয়া হবার যো নেই।

আমাদের শিল্পশাস্ত্রকারদের সবাইকেই কড়া মাস্টার এবং আর্ট-কোতোয়ালীর দারোগা বলে ভুল করলে চলবে না। পূর্বেকার তাঁরা কালোপযোগী যেসব শিল্প সেগুলির কথাই ভেবে গেলেন। একালের শিল্পে কি উপযোগী-অনুপোযোগী এটা একালের শিল্পী ও শিল্প-রসিকদের উপরে ছাড়া রয়েছে।

তখনকার শিল্পের রীতিনীতি ক্রিয়াকলাপ প্রথা প্রকরণ সংগ্রহ

করলেন তাঁরা শাস্ত্রের আকারে নানাজনে—'স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ লোকহিতার্থং সংগ্রহেণ বৈ,' (শুক্রনীতিসার)। শুক্রাচার্য কেন যে শিল্পশাস্ত্রখানা লিখলেন তা নিজেই বলে গেলেন, যথা :

অল্পায়ুভূভৃতাদর্থং সংক্ষিপ্তংতর্কবিস্তৃতম্ ক্রিয়ৈকদেশবোধীনি
শাস্ত্রান্যন্যানিসন্তি হি।
সর্ব্বোপজীবকম্ লোকস্থিতিকৃন্নীতিশাস্ত্রকম্ ধর্ম্মার্থকাম
মূলংহিস্মৃতং মোক্ষপ্রদং যতঃ॥

সেকালের স্তরের উপরে একালের শিল্পের প্রতিষ্ঠা হল স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা, সেকালটা সিন্দবাদের বুড়োর মতো একালের ঘাড়ে উঠে বসল এ বড় বিষম প্রতিষ্ঠা—বাড়ির ভিত উঠে এল ছাদের উপরে, খুব-একালের বাস্তুশিল্পীর মতেও এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

মানব-শিল্প সেকাল একাল ও ভবিষ্যকালের যোগাযোগে বর্ধিত হয়ে চলে, কোনো এককালের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাকে ধরে বেঁধে স্থির করে রাখার উপায় নেই! ক্রিয়াশীল আর্টিস্ট ক্রীড়াশীল তার মন দুরন্ত-প্রকৃতির শিশুর মতো কখনো মানে নিয়ম, কখনো ভাঙে নিয়ম—এই শিল্পীসমস্তকে নিয়ে শাস্ত্রসম্মত মূর্তি চিত্র ইত্যাদি রচনা করাতে গিয়ে থেকে-থেকে যে শাস্ত্রকারেরা ঠেকতেন তার সাক্ষী দিচ্ছে শাস্ত্রবাঁধা অনুশাসনগুলিই! শাস্ত্রকার গণ্ডি টানলেন যথা : শাস্ত্রমতো দেবমূর্তি গড় যথা মান যথা লক্ষণ—'নান্যেনমার্গেণ প্রত্যক্ষেণাপিবাখলু,' ধ্যান মানার ধ্যান ধরে গড়তে চলল শিল্পী, কিন্তু একটা মূর্তি হল হীনাঙ্গ অন্যটা হল অধিকাঙ্গ। ধমক খেলে শিল্পী—'হীনাঙ্গী স্বামিনং হন্তি হ্যধিকাঙ্গী চ শিল্পিনম্।' মরার বাড়া গাল নেই, এতেও কাজ হল না—কোনো মূর্তি হল রোগা-রোগা গঠন কোনোটা হল স্থূল গঠন! শাসন হল—'কৃশা দুর্ভিক্ষদা নিত্যং স্থূলারোগপ্রদা সদা।' শাসনের এই অত্যাচার কলই সইতে পারে মানুষ নয়, সে পদে-পদে গণ্ডি ভাঙে সুতরাং ঢিলে দিতে হল দোষ আবিষ্কারের কাজে—

লেখ্যালেপ্যা সৈকতী চ মৃন্ময়ী পৈষ্টিকী তথা
এতেষাং লক্ষণাভাবে ন কশ্চিৎ দোষ ঈরিতঃ।

প্রতিমায়াশ্চ যে দোষাহ্যর্চ্চকস্য তপোবলাৎ
সর্ব্বত্রেশ্বর চিত্তস্য নাশং যান্তি ক্ষণাৎকিল॥

অর্থাৎ লেখনী দিয়ে লেখা চিত্রাদি, আলিম্পন দিয়ে টানা, বালি পাথর ও মাটি দিয়ে এবং পিটুলি দিয়ে গড়া যেসব প্রতিমা, সকল শাস্ত্র-মতো সুলক্ষণাক্রান্ত না হলেও দোষের হয় না! অথবা যেমন বলা হল : প্রতিমার নির্মাণে যদি কোনো দোষ থাকে তো সে ঈশ্বর-চিত্ত অর্চকের তপোবলে নির্দোষ হয়ে ওঠে! এতে করে ছবি, মডেলিং, প্লাস্টার কাস্টিং, পুতুল-গড়া ইত্যাদি নানা শিল্প শাস্ত্রীয় বাঁধনের কষন্ থেকে ছাড়া পেয়ে গেল, কেবল পাষাণ এবং ধাতুজ যেসব পূজার জন্য মূর্তি সেসব শাস্ত্রীয় মান-পরিমাণাদি ধরে রচিত হয়ে রইল।

অন্যান্য শাস্ত্রের কোথায় কি ফাঁকি আছে তা জানিনে, কিন্তু শিল্প-শাস্ত্রের শাসনগুলির মধ্যে অনেকখানি করে যে ফাঁকি আছে তা দেখা যায়। 'শাস্ত্রমানেন যো রম্যঃ স রম্যো নান্য এবহি'—শাস্ত্রমতো গঠিত হল যে মূর্তি সেই মূর্তিই হল রম্য। কাজে কিন্তু দেখা গেল শাস্ত্রমতো গড়া প্রতিমা সবই সুন্দর হয়ে উঠল না। একদল শিল্পকার বলে উঠল—'তদ্‌রম্যং যত্র লগ্নংহি যস্য হৃৎ'—মনে যেই ধরল মনোমতো সেই এই বলল! পণ্ডিত ঘাড় নাড়লেন, তা হয় না—'শাস্ত্রমান বিহীনং যৎ অরম্যং তৎ বিপশ্চিতাম্‌'—ও তোমার মনোমতো যাই থাক শাস্ত্রমতের মান পণ্ডিতের কাছে আছেই আছে! ওর মধ্যে রসিক এসে বললেন—'সর্ব্বাঙ্গৈঃ সর্ব্বরম্যোহি কশ্চিৎল্লক্ষে প্রজায়তে'—সর্বাঙ্গসুন্দর লাখে এক মেলা দুষ্কর! শিল্পশাস্ত্রকারে শিল্পকারে এবং রসশাস্ত্রকারে তখন যে তর্ক ছিল এখনো সেই ভাবে তর্ক চলেছে কিছু-কিছু এ-দেশে সে-দেশে—তর্কের আর শেষ নেই!

······৭······

'পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াভির্হি কলাভেদস্তু জায়তে' (শুক্রাচার্য)—ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়া ধরে হল বিভিন্ন শিল্পের প্রকাশ। কুমোর কাঠামোর উপরে মাটি চাপিয়ে ক্রিয়া করে গেল ঠাকুর গড়ার বেলায়, আবার সেই কুমোরই হাঁড়ি-পাতিল গড়ার বেলায় চাক ঘুরিয়ে আর এক ক্রিয়া করলে। দুটো শিল্প দুই কাজের শিল্পী তৈরি হল। কুমোর মাটির প্রতিমা গড়ে নিজেকে ভাস্কর বলতে পারলে না, পাথর কাটবার স্বতন্ত্র ক্রিয়া ধরে একদল হল ভাস্কর-শিল্পী, আবার নানা ধাতুকে ছাঁচে ঢালাই করার ক্রিয়া ধরে এক দল হল কাঁসারী সেকরা প্রভৃতি নানা শিল্পের নানা শিল্পী। ধুনুরী তাঁতের যন্ত্রে তুলো ধুনলে এক প্রকার ক্রিয়ায়, রবাবি তাঁতের যন্ত্র থেকে সুর বার করে চললে আর এক ক্রিয়া দ্বারায়।

তুলি কলম চালানোর ক্রিয়া এবং আনুষঙ্গিক বর্ণ প্রলেপাদির ক্রিয়া সমস্ত জানা হল তো চিত্রশিল্পে চিত্রকর হল মানুষ। তুলি বুলিয়ে পাথর কাটা চলল না, সারঙ্গী বাজিয়ে সুরের বাজারে তুলো-ধোনা চলল, কিন্তু তুলোর বাজারে তা কাজ করলে না।

ছবি লেখা যায়—তাই লেখনী দিয়েও চলে কাজ, তুলি দিয়েও চলে কাজ। জাপানে তারা এক তুলিতে ছবিও লেখে চিঠিও লেখে কবিতাও লেখে বাজারের ফর্দও লেখে। মাত্র একটু-আধটু ক্রিয়ার ভেদে নানা রকম লেখ্য শিল্প দেখা দিলে।

কথাই আছে 'কালি কলম মন লেখে তিনজন,' শিল্পীর হাত মন ও হাতের যন্ত্র তিনই মিলে-জুলে ক্রিয়া করে চলল, শিল্পকর্ম সহজে সুনিষ্পন্ন হল। কোথাও বা শুধু মন আর হাত কতক শিল্পের উদ্ভাবনায় কাজে এল হাতের যন্ত্রের অপেক্ষা না রেখেই—যেমন কুমোরের বৌ পুতুল গড়লে শুধু হাতে, যেমন মন্দিরার অপেক্ষা না রেখে নর্তক রাখলে তাল হাতে, চলল নেচে পা সহজে। বয়নশিল্প রাখে তাঁতযন্ত্রের অপেক্ষা, মনের অপেক্ষা যন্ত্রপ্রধান এই শিল্প। কিন্তু নানা সূচীকর্ম কাঁথা ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে সলমা-চুমকির কাজ পর্যন্ত হাতের ক্রিয়া

মনের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। তাঁতে বোনা কাপড়ের পাড় যন্ত্রের উপর নির্ভর তার, কিন্তু সূচীশিল্প—সেখানে শিল্পীর অন্তরের যোগ যথেষ্ট থাকে। এই ভাবে আবার দেখি ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার—টেকনিক-এর কৃত্রিমতা ও অকৃত্রিমতা ভেদ নিয়ে কতক শিল্প পড়ল ফাইন আর্টের কোঠায়, কতক পড়ল ক্রাফ্‌টের কোঠায়।

সব শিল্পকাজে ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলো (টেকনিক) ছাপিয়ে চলা একটা মস্ত কৌশল। অকৃত্রিমভাবে সহজে ক্রিয়া করে চলার আর্ট বড় কম আর্ট নয়। নর্তন-ক্রিয়া নটন-ক্রিয়ার বাহাদুরিই হল টেকনিক গোপন করে নেচে চলা স্বাভাবিক ভাবে—'ছন্দো নর্ত্তয়িতুং যথৈব মনসাশ্লিষ্টং তথা স্বং বপুঃ।' সকল বড় শিল্পীর মূলমন্ত্র হল অকৃত্রিমতা অথবা যান্ত্রিকতা লুকিয়ে চলা বলা সবই।

সর্ব কর্মের সঙ্গেই ক্রিয়াটি নিষ্পাদনের প্রক্রিয়া। সচরাচর চলা বলা নিয়ে বিনা অভ্যাসাদিতে কেউ ভালো নট ভালো অভিনেতা ভালো বক্তা হয় না।

মনের মধ্যে যা রয়েছে নানা ক্রিয়া ধরে সেটা প্রকাশের উপায় হল তো হল, নয়তো মনের কথা মনেই রয়ে গেল, একের মন থেকে অন্যের মনে প্রবেশের পথ পেল না!

ছবিতে রঙ-রেখার রকম-রকম প্রক্রিয়া ধরে কোনো ছবিটা হল ল্যাণ্ড-স্কেপ, কোনোটা পোর্ট্রেট, কোনোটা ক্যারিকেচার। ক্রিয়া-প্রক্রিয়াদির উৎকর্ষ অপকর্ষ বশত কোনো ছবিতে পাই যশ, কোনো রচনায় পাই অপযশ। পাত্র ভেদে দর্শক শ্রোতার উপরে শিল্পরচনা সমূহের প্রতিক্রিয়া এক-এক রকম হয়ে থাকে। 'জু'-গার্ডেনে খাঁচার সামনে ভালো সংগীত মজলিশ বসালে বিপরীত কাণ্ড হতেও পারে নাও হতে পারে খাঁচা-বিশেষের মধ্যে! এখানে শিল্পরচকের কোনো হাত নেই। কার ভালো লাগবে কি না লাগবে সেদিকে লক্ষ্য থাকা চাই বটে, কিন্তু প্রধানত কর্মের সুচারুতার দিকে লক্ষ্য থাকা দরকার শিল্পীর। ভিতরের তাগিদে যে কর্ম করে সুচারুরূপে কর্মসম্পাদনই হয় তার লক্ষ্য। 'কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ'—কর্ম করতে-করতে হাত খোলে বুদ্ধি খোলে।

অক্ষর সৃষ্টি হবার পূর্বে গুহাবাসী মানুষরা যেসব ছবি লিখলে এখনকার অনেক শিল্পী তেমন হরিণ, মহিষ, বাঘ ইত্যাদি লিখতে পারে না বলতে চাইনে, শুধু দেখি এইটুকু আশ্চর্য যে প্রাচীনতম যুগের

শিল্পীর সামনে শিল্পশাস্ত্র না থাকলেও শিল্পক্রিয়া-প্রক্রিয়া সমস্তে দখল নিতে তাদের ঠেকতে হল না!

শিল্পশাস্ত্রের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থামতো ক্রিয়া করে চলার অনেক পূর্বে শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নিয়ে অনেকখানি শিল্পবিষয়ে দক্ষতা পেয়ে গেছে শিল্পব্রত মানুষ তারা।

সব জাতেরই ধর্মশাস্ত্র আছে এবং সেই সব ধর্ম পালন করে চলার নিত্যক্রিয়া পদ্ধতিও স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু সেই সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া করে মানুষ পরলোকে কোন পদ পেলে তা যাচাই করার উপায় নেই। ছবি গান ইত্যাদির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ফল প্রত্যক্ষ দেখি আমরা গীতের ভালো-মন্দ, ছবির ভালো-মন্দ দিয়ে, বুঝিও সেই-সেই ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ঠিক-বেঠিক হিসেব। কাঠে-কাঠে ঘর্ষণের বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারায় আগুন বার হয় শোনা কথা। মেঘমল্লার গেয়ে বৃষ্টি নামানো যায়, দীপক রাগ গেয়ে আগুন জ্বালানো যায় এ সবই লোক-প্রসিদ্ধি, পরীক্ষার দ্বারায় এসব প্রক্রিয়ার সত্যাসত্য প্রমাণ করা শক্ত। এখনো মেয়েরা নানা ব্রতক্রিয়া করে চলেছে বৃষ্টির আশায় ফসলের আশায় স্বামীর ঘরে আদর পাওয়ার এবং সপত্নীর মাথা খাওয়া ও মাছে-ভাতে থাকবার আশায়। পুরুষেরা চলল নানা যাগযজ্ঞ ক্রিয়া করে বৈদিক যুগ থেকে। ইন্দ্রকে খুশি করে জল আদায় হল না সে ক্রিয়ায়, ধূম হল যথেষ্ট কিন্তু আগুনে কাঠ পোড়ানোতে ঘী জ্বালানোতে! পাথরে চন্দনকাঠ ঘর্ষণের প্রক্রিয়ার দ্বারায় চন্দন-পঙ্ক লাভ করা গেল, বারুদে আগুন ছোঁয়ানোর ক্রিয়াতে প্রচণ্ড শব্দে একটা ভীষণ কাণ্ডের অবতারণা হল, প্রক্রিয়ার পরীক্ষার সঙ্গে-সঙ্গেই ফল পাওয়া গেল। নীলে মেলালাম হলুদ, লালে মেলালাম নীল, পাওয়া গেল সবুজ বেগুনি।

ক্রিয়া থেকে আরম্ভ করে ক্রিয়ার সার্থকতাতে পৌঁছতে সময় লেগেছে মানুষের। অনেক ক্রিয়া ব্যর্থ হয়ে তবে কর্ষণযন্ত্র, বুননযন্ত্র, কুলালচক্র, এইসব প্রস্তুত হল, সেগুলো নিয়ে অনেক ক্রিয়াকাণ্ড চলল তবে মনোমত অন্নবস্ত্র তৈজসপত্র পেলে মানুষ। শৌখিন এবং উচ্চ অঙ্গের শিল্পকলার বেলাতেও এই কথা ঘটল—চলতে-চলতে টলতে-টলতে হাত-পায়ের নানা ক্রিয়ায় অভ্যস্ত হতে-হতে তবে নাচতে পারলে। আধো-আধো বলতে-বলতে সুরে বলতে শিখলে মানুষ সপ্তস্বরের নানা প্রক্রিয়া ধরে।

শিল্পক্রিয়া যখন ধারাবাহিক ভাবে এককালের থেকে আর এক কালের মধ্যে নতুন-নতুন শিল্পীর দলের হাতে পড়ে মার্জিত হতে-হতে প্রতিষ্ঠা

পেলে, তখনই সেই ক্রিয়ার ফল সমস্ত সম্পূর্ণতা পেয়ে মানুষের ভোগের কাজে এল। সেকাল চলেছে একালের ক্রিয়ার ছন্দ ধরে ভবিষ্যৎ কালের সফলতার দিকে, তবে এতকাল পরে বর্তমানে পেয়েছে মানুষ ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি-উৎপাদনের একটুখানি দেশলাই-কাঠি। ধুতির কিনারায় চুলের মতো কালো পাড়টি পেতে অনেকগুলো রাজসূয় যজ্ঞের মতো ক্রিয়া করতে হয়েছে অনেক কাল!

আর্টিস্ট হতে চাই তো ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, প্রথা-প্রকরণ, উপচার-উপকরণাদির বিশেষ-বিশেষ প্রয়োগ-কৌশলে সফলতা লাভের তপস্যা করা চাই। এ তপে কঠোর করা আছে বটে কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া করে সফলতা লাভ করতে চলায় ভারি একটা আনন্দ আছে শিল্পকর্মে।

> There is fascination in the technical side of art without which artists would stop short as soon as the excitement he experienced on first tackling the subject has subsided...

হাতুড়ির তালে-তালে ছেনি পাথর কেটে চলেছে, বাদ্যের তালে-তালে হাত-পা উঠছে পড়ছে শরীর হেলছে-দুলছে, যেমন-যেমন অভ্যস্ত হচ্ছে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া করে চলায়, এতে আনন্দ আছে আর্টিস্টের শরীর মন দুইয়েরই।

ভালো লেখবার, ভালো আঁকবার, ভালো গড়বার প্রকরণ সমস্ত যত্ন-সাধ্য হলেও নিরস নয় যার কাছে, তারই কাছে ধরা দেয় আর্ট। সুতরাং বলতে পারি নুড়ির আগাগোড়া যে ভাবে নিরস সে ভাবে নিরস নয় আর্টের টেকনিক। বাদামের মতো উপরে শক্ত ভিতরে নরম শাঁস মনোহর সমস্ত প্রকরণ মনোমতো বস্তু রচনার, যা নিয়ে ক্রিয়া করে চলার আনন্দে দিন কাটিয়ে দেয় আর্টিস্ট মনের ভুলে। আক চিবোতে দাঁতের বেদনা আছে বটে কিন্তু রসের স্বাদ ভুলিয়ে দেয় সে বেদনা। প্রাচীন নাটকে পড়া যায় সিঁদ কেটে তার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁদেল আনন্দে মশগুল আছে!

ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ শিল্পী রোদাঁকে তাঁর শিষ্য প্রশ্ন করেছিলেন—

> Can an artist get along without technique?

তাতে শিল্পগুরু উত্তর দিলেন—

On the contrary it is necessary to have consummate technique in order to hide what one knows...the great difficulty and crown of art is to draw, to paint, to write with ease and simplicity.—*Rodin*

এখানে যে ক্রিয়ার দ্বারায় যান্ত্রিকতা থেকে কর্মটিকে মুক্তি দেওয়া চলল তাকেই বলা হয় কন্‌সুমেট টেকনিক বা প্রকৃষ্ট প্রকরণ। শিল্প-রচনায় টেকনিক মর্যাদা পায় যান্ত্রিকতা থেকে রচনাকে বাঁচায় বলে।

কি রকম কষে ছন্দ বাঁধা হল ছন্দশাস্ত্র ধরে এই কবিতায় দেখ :

ভব অনুজ রথ তা তলে বিনতাসুত কোরে কুমুদবন্ধু সাজে
হরি অরি সন্নিধানে অলিরস পুরে বাণে রমণী মুনির মন বান্ধে।

অনমনীয় টেকনিক রমণীয় চিত্র দিতে গিয়ে ফর্মাতেই বাঁধা রয়ে গেল!

প্রকৃষ্ট প্রকরণ প্রথা প্রণালী ইত্যাদিতে অধিকার না হলে প্রসাদগুণ পৌঁছানো মুশকিল হয় শিল্প-রচনাতে।

এত সহজে কেমন করে যা বলবার যা দেখবার তা প্রকাশ করে গেল এইটেই চোখ ও মন লক্ষ্য করে সব বড় শিল্পীর কাজে। শিল্পী কি কঠিন প্রক্রিয়া ধরে রচনা করলে সেটা ধরা থাকে না—শিল্পী নিজেই মুছে দিয়ে যান সে হিসাব।

নকলনবিস ঠেকে তাই পদে-পদে বড় শিল্পীর কাজের নকল তোলবার বেলায়, অন্ধি-সন্ধি পায় না কোন পথে গিয়ে শিল্পী পরম মণিটি আবিষ্কার করলেন।

ছবি, মূর্তি, নাচ-গান, এসবেরই বাঁধা নিয়ম প্রকরণাদি আছে। বাঁধা সুরে রাগ-রাগিণী ভাঁজো, বাঁধা তালে পা ফেলে নাচ, বাঁধা দস্তুরে রঙ চাপাও, রেখা টানো, পাথর কাটো, কাদা টেপ, কিন্তু দেখবে প্রকরণিক ছাড়া বেশি কিছু বলতে পারবে না আপনাকে।

দরদী বললেন প্রকরণের বাঁধন দরদ দিয়ে মুক্ত করে মুক্তকণ্ঠে গেয়ে চল, মুক্তি দাও হাত-পাকে সহজ চলার আনন্দে, বাঁধনের কষণ রসিয়ে তুলুক লসন, শোভা ধরুক টেকনিক-এর বাঁধন।

প্রকরণের সফলতা হচ্ছে সহজকরণে। যে প্রকাশের মধ্যে আর্টিস্টের

প্রকরণ ও ক্রিয়াদির প্রয়াসই ব্যক্ত হল, প্রসাদগুণ পেঁছল না সে কাজে প্রসন্ন হল না মনও সেটা দেখে।

নানা প্রথা-প্রকরণের মধ্যে দিয়ে কাজটির আরম্ভ থেকে শেষ এই সময়-টুকুর মধ্যেই যা কিছু আনন্দ পান আর্টিস্ট। রচনা শেষ হল হাতে-কলমে আর্টিস্টের সঙ্গে কাজটির যোগ বিচ্ছিন্ন হল, দর্শক এল সে কাজ উপভোগ করতে! আর্টিস্ট হল নতুন কাজের প্রক্রিয়ায় নিবিষ্ট। কাজ করে চলায় যে আনন্দ হল আর্টিস্টের, শ্রম সেখানে ভরে উঠছে আনন্দের ধারায়, মিটছে দুঃখ কাজ করে চলার স্ফূর্তিতে! আনন্দের সঙ্গে কর্মসাধনের প্রকরণ হল অসামান্য প্রকরণ আর্টের।

শিল্পশাস্ত্রে একটি কথা আছে—'আদানে ক্ষিপ্রকারিতা প্রতিদানে চিরায়ুতা'—নানা শিল্পে নানা প্রথা-প্রকরণ শিল্পীকে দেশ-বিদেশ থেকে আদায় করতে হয় চটপট যখন, তখন বাচবিচার নেই, শুধু সেই প্রকরণ প্রয়োগের সময় বিচার ও ভেবেচিন্তে ক্রিয়া করার কথা ওঠে।

মানুষের চেহারা এবং ভূদৃশ্য আঁকার নতুন-নতুন প্রকরণ বিদেশীরা দেখাচ্ছেন; ভারতশিল্পের আভিজাত্য বজায় রাখতে পূর্বার্জিতের মধ্যে নিজেদের বন্ধ রাখলে নতুন প্রথা-প্রকরণের অর্জন করা ঘটবেই না কোনো কালে। এককালে ভারতশিল্পী গ্রীসের স্পর্শে এসেছে, মোগলের স্পর্শে এসেছে, পার্বত্য জাতির সম্পর্কেও এসেছে তাতে তার শিল্প সম্পদ নানা প্রকরণ নানা প্রথার দ্বারায় বৃদ্ধিই হয়েছে, সুতরাং প্রথা-প্রকরণের অর্জনে বাধা দেওয়া ঠিক হয় না।

> Everything is worth knowing ; learn the art and lay it aside—

এ হল পাকা আর্টিস্টের কথা।

সামান্য একটা মাটির পুতুল তার গড়ার প্রক্রিয়া যেমন সহজ, রঙ দেবার পালিশ করবার কাজও এমন সহজ যে অনায়াসে যে কেউ হোক না পুত্তলিকা গঠনের কারিগরীটা চট করে আদায় করতে পারে। কিন্তু পুত্তলিকাকারের প্রকরণের সঙ্গে খেয়াল বলে যে একটা কাণ্ড জড়িয়ে আছে সেটা না পেলে শিক্ষার ফল পাওয়া দুষ্কর। এই ভাবে পুত্তলিকা-শিল্প শুধু প্রকরণ দখলে কুমারটুলির পুতুলের ভান মাত্র দিতে পারে।

ততোধিক কিছু, অর্থাৎ নতুন-নতুন পুত্তলিকার উদ্ভাবন, খেয়াল এবং খেয়ালী মানুষের অপেক্ষা রাখে।

মানব সমাজ কালে-কালে সামাজিক কাজ চলার প্রথা-প্রকরণাদি ভেঙে যেমন কালোপযোগী ক্রিয়া সমস্ত ধরে, আর্টের রাজত্বেও তেমনি প্রাচীন প্রথা-প্রকরণ কালে-কালে সংস্কৃতি ও নব প্রবর্তনের রীতি অবলম্বন করে, না হলে দেশের শিল্পে কতকগুলো প্রকরণিক ভূতের উৎপাত শুরু করে দেয়। কালোয়াতি গান নিয়ে আমাদের এই বিপদ উপস্থিত হয়েছিল, নাচ নিয়েও হয়েছিল, পট নিয়ে প্রতিমা নিয়েও সেই কাণ্ড হয়েছিল। যথার্থ খেয়ালী সমস্তের অভাবে, এক দল আকবরী আমলের খেয়াল গানে নাচে ছবিতে পুনরুক্তি করেই চলেছিল, পুনরুজ্জীবন দূরের কথা, তাতে করে জীবের জীবন অতিষ্ঠ হবার যোগাড়। তবু এখনো শুনতে হয়—'ভারত-শিল্প-পদ্ধতির নামে শিল্প-সঙ্কর্যের উদয় হইতেছে বলিয়া তাহার কৌলিন্য রক্ষার চেষ্টা করা আবশ্যক...'

প্রাচীন কুণ্ড কিছু সংস্কার করে নতুন জল প্রবেশের পথ করাকে তারাই ভয় করে যারা ভীষণ রকম সেকেলে। একাজে তারা নতুন প্রকরণ অর্জনের বাহাদুরি দেখে না, দেখে সন্দেহের চোখে এবং গম্ভীরভাবে বলে খাল কেটে কুমির আনা হচ্ছে, জাতঃপাত করা হচ্ছে, আধ্যাত্মিকতা নষ্ট করা হচ্ছে ভারত-শিল্পের। সঙ্করত্ব পাছে আসে প্রাচীন শিল্পে এই ভয় করে প্রাচীনতার কারাগারে প্রাচীন প্রথা-প্রকরণের ভয়ঙ্করত্ব দিয়ে বাঁধা শিল্প আমাদের। আপনা হতে যখন জরা আর মৃত্যুর লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তুলবে তখন শিবেরও অসাধ্য হবে তাকে নবজীবনের সৌন্দর্য দান করা!

বিশ্বকর্মা যদি পূজার্থ দেবমূর্তি গড়েই চলতেন তবে এতদিনে বিশ্বে অনাসৃষ্টি বাধত। শিল্পের আধ্যাত্মিক তুলসীমঞ্চ সমস্ত জগৎ ছেয়ে ফেলত। গাছ দেখার আনন্দ এক তুলসী গাছের তলায় পিদুম ধরে শেষ হত!

বর্ণের সঙ্করতা দিয়ে দুই সন্ধ্যার কী রমণীয় ছবিই দিয়ে চলেছেন বিশ্বকর্মা, কী বিশুদ্ধ পবিত্র ছবি। হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের ধ্যান প্রকরণ ধরে গড়া ত্রিসন্ধ্যার ছাঁচ সে এক জিনিস, এক ভাবে সুন্দর, এও এক ছবি এক ভাবে সুন্দর যা আজকের প্রথা-প্রকরণ ধরে সন্ধ্যার ভূদৃশ্যটি দেখাচ্ছে। ভারত-শিল্পকে এত জাতের শিল্পের ছোঁয়া-লেপা স্বীকার করতে হয়েছে যে ওকে আর বিশুদ্ধ গব্যাকারে ধরবার উপায় নেই ছোট

ভাঁড়ের মধ্যে! কবিদের মতো আর্টিস্টদেরও নিরঙ্কুশ অবস্থায় নিজেদের পন্থায় চলতে দেওয়া ছাড়া উপায় দেখিনে। অনেক কিছু প্রাচীন প্রকরণ অনেক কিছু নতুন প্রকরণ এই নিয়ে এখন চালাতে হবে কাজ আর্টিস্টদের, তারপর যদি আসে দেশের শিল্পে নবযুগ।

একদিকে রইল রস দেবার নানা উপকরণ প্রকরণ নিয়ে ক্রিয়া করে চলেছে যে আর্টিস্ট সে, আর একদিকে রইল রস-উপভোক্তা রসিক সে। একজন পাচ্ছে শিল্প-ক্রিয়া করে আনন্দ আর একজন পাচ্ছে সেই সমস্ত রস-রচনা ভোগ করে আনন্দ। দর্শক প্রদর্শক এই দুই নিয়ে তবে জমে শিল্পের মজলিশ। বিশ্বরচনা সমস্তই স্বাধীনা অনন্যপরতন্ত্রা। দর্শকের অপেক্ষা না রেখেও বর্তালো তারা। আমরা কেউ দেখি না-দেখি আকাশে চলে আলো-অন্ধকারে খেলা, বনের গাছ ফোটায় ফুল, দ্রষ্টার অপেক্ষা নেই, কিন্তু যেদিন মানুষ দর্শকের স্থানে এল এবং বললে—'ইদম বা অগ্রনৈব কিঞ্চিৎ আসীৎ,' সেই দিন থেকে সৃষ্টির লীলা দর্শক-প্রদর্শকে মিলে যথার্থ ভাবে আরম্ভ হল।

যে নিয়মে প্রকৃতির সৃজনক্রিয়া চলল, সেই নিয়মের অনুরূপ পথ ধরে চলল মানুষের সৃষ্টিকার্য। এই কারণেই ঋষিরা বললেন মানবশিল্পকে—'দেবশিল্পানামনুকৃতির্হিরিইলোকে!' সৃষ্টি রচনা ধরে মানুষের মন রচয়িতার পরিচয় পাচ্ছে, মানুষের শিল্পসৃষ্টির বেলাতেও এই নিয়ম খাটল। প্রদর্শকের পরিচয় নিচ্ছে দর্শক শিল্প-রচনার মধ্য দিয়ে। আর্টের রাঙানো পট—প্রভাতের আকাশ সন্ধ্যার আকাশ যেন ছন্দে দুলছে, এরই ওপারে প্রদর্শক, এপারে দর্শক, মাঝে শিল্পরচনা। এদিকে রইল বাগানের মালী, ওদিকে রইল বাগানের মালিক, মাঝে রইল ফুলের তোড়া, ফুলের মালা নানা কৌশলে গাঁথা। এই হল রস-সৃষ্টি ও তার উপভোগের লীলা খেলা।

আর্টকে পেতে তপস্যা, আর্টকে বুঝতে তপস্যা, কারিগরির তপস্যা সমঝদারের তপস্যা। এই তপস্যার ফলে দুজনের মন রসের গোপন ধারা বয়ে মিলতে চলে। শিল্পী পেলে ঠিক সমঝদার, সমঝদার পেলে ঠিক শিল্পী, রসের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হল তবেই।

বিশ্বপ্রকৃতি আপনার রচনা সমস্তের বিরাট রহস্য-প্রাচীরের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে রস, সে রসের খেলায় যোগ না দিয়ে, আকাশ-বাতাস জলে-

স্থলে যে লীলা চলেছে তার মধ্যে সন্ন্যাসীর মতো নিরাসক্ত ভাবে বসে থাক নিশ্চিন্তে—কেউ এ-কথা বলে সুখে থাকে, কেউ তা পারে না, সৃষ্টির খেলায় ছোটে যোগ দিতে—এরাই হয় আর্টিস্ট বা খেলুড়ি। দেখ না, ফুটবলের খেলুড়ির দলে কেবল তারাই ঢুকতে পায়—বহু পরিশ্রমে যারা খেলার কৌশলকে পায়। বাকি লোক তারা দর্শক হয়ে খেলা উপভোগ করে, কেউ সমঝদারের মতো, কেউ বা সহজ দর্শকের মতো খেলার মেলায় ভিড় করে গিয়ে।

রূপ-রসের রাস্তা ধরে রচনাটি শেষ করে আর্টিস্ট হাত গুড়িয়ে বসল তারপর এল ভোক্তার পালা, দর্শকের পালা, শ্রোতার পালা। রচয়িতাকে খানিকটা ভোক্তার কাজও করতে হয়। মধুকর মধুর স্বাদ না লাভ করলে মধু সঞ্চয় কেন করবে? শুধু মোম দিয়ে মৌচাক বানিয়ে মধুকর ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু বোলতা মধুর খোঁজ রাখে না—চাক প্রস্তুত করে যার মধ্যে মধু বিন্দুমাত্র পাইনে। এই যে রসের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা এ তো দেখি সব মানুষ পেলে না, শুধু শিল্পী আর রসিকই এ বিষয়ে অধিকারী হল।

এই যে শিল্প-রচনা থেকে রসের স্বাদ পাওয়া যায় তার সম্বন্ধে রস-শাস্ত্র বলছেন যে, রস অনির্বচনীয় উপায়ে আপনার স্বাদ জানায় শিল্পী আর রসিককে—'হৃদয়মিবপ্রবিশন্ সর্বাঙ্গীণামিব আলিঙ্গন্ ব্রহ্মস্বাদমেব অনুভাবয়ন্'—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রূপ ফোটানো এবং রস গছানো এই দুই কাজ হল শিল্পীর। এর মধ্যে রূপ ফোটানোর ক্রিয়াটি নানা প্রথা-প্রকরণে শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারায় সুনিষ্পন্ন করেন শিল্পী। কিন্তু রস গছানোর ক্রিয়াটি এত সহজ নয় যদিও যে-যে উপায়ে—ভাব-বিভাবাদি, রূপ ও রূপকাদি, প্রতিমা প্রতীকাদি—ধরে রস উদ্রেক হয় তার সুনির্দিষ্ট হিসেব সমস্ত দেওয়া হল রসশাস্ত্রে অলঙ্কারশাস্ত্রে।

বীণা, বাঁশি এসবের গঠনের নিয়ম মান-পরিমাণ সমস্তই বাঁধা, এদের বাজাবারও কায়দা বাঁধা দস্তুরে শিক্ষকের কাছে ধরা রইল। কিন্তু বাজানোর দ্বারায় রস উদ্রেক কেমন করে করতে হবে তার উপদেশ কোনো কোথাও ধরা নেই। এমনি নৃত্য নাট্য এসবেতেও দেখি কতকগুলি মুদ্রা কতকগুলি অঙ্গভঙ্গী বাঁধা দস্তুরে ভাব প্রকাশের জন্যে রয়েছে। বাঁধা দস্তুরে নেচে চললে হয়তো কতক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল কিন্তু তাই বলে সে কাজটাকে রসবর্ষণ কি রসোচ্ছাসের উদ্রেক করা গেল বলে ধরা তো

গেল না! রসোদ্রেকের ব্যাপার দরদের সঙ্গে জড়ানো। দরদ দিয়ে যে বাজালে, যে নাচলে বা গাইলে, সে-ই দেখা যায় অনেক সময়ে রসও জাগালে। অবশ্য এখানেও দরদী শ্রোতা, দ্রষ্টা এদের অপেক্ষা আছে—'কবিতা রসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি।'

রূপ, রূপক, প্রতীক, এই সমস্তের দ্বারা বাহিত হচ্ছে রসের ব্যঞ্জনা আমাদের কাছে দর্শন স্পর্শন ও শ্রবণের রাস্তা ধরে। কি সহেতুকী রস, কি অহেতুকী রস, সকল রসের গতি হল মনের দিকে। চোখের দেখা শেষ হচ্ছে গিয়ে প্রাণের দেখায়—'আমার নয়ন ভুলানো এলে, আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে' (রবীন্দ্রনাথ)। ধ্বনি পেঁছিল মর্মে—'কোথায় সোনার নূপুর বাজে বুঝি আমার হিয়ার মাঝে' (রবীন্দ্রনাথ)। তাজমহলের প্রতীক ধরে চমৎকারী মর্মস্পর্শী পরশ পেঁছিল মনে—'পাষাণ-গলা সুধা ঢেলে নয়ন ভুলানো এলে' (রবীন্দ্রনাথ)।

আলো-ছায়ার মধ্যে রূপ সমস্ত প্রকাশ পাচ্ছে—'ছায়াতপয়োরিব'... চোখের উপর ভেসে গেল রূপ চলতি মেঘের ছাঁদ ধরে, মনের গভীরে উঠল ভাবের ছন্দ—'শীতকাইলা বেলা চলতি নুকা দেখতে-দেখতে যায়, আন্ধার ঘনায়া আসে গর্জন্যার মুড়ায়' (পল্লীগীত)।

রসের অভিলাষ রস-রচনায় প্রবৃত্ত করায় এবং রসাভিলাষ রস-রচনাতে প্রবৃত্তি জন্মায়। শিল্পী এবং শিল্পরসিক দুইয়ের পক্ষেই একথা খাটে। বৃষ্টির লক্ষণ নেই বর্ষণ হোক এই আকাঙ্ক্ষা ধারাব্রতের ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত করালে মানুষকে—চিত্রে নাটে গীতে নানা রস-রচনার পথ ধরে ব্যক্ত হল সেই অভিলাষ, বাদল আসবার পূর্বে থেকেই। বাদল দিন এসে আর এক রস পেঁছে দিলে, তখন জাগল আর এক অভিলাষ, রসরচনা ধরলে তারই ছাপ—'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর!'

রসাস্বাদ বিষয়ে অধিকারী-অনধিকারী ভেদে নানা বিতর্ক ওঠে, আবার একই রস-রচনা তারও বেলায় ঐ কথাই উঠল, কেউ বললে রচনাটি উত্তম, কেউ মধ্যম, কেউ অধম। এতে করে দেখা যায় রস-রচনা সমস্তের বিচার কোনো একটা নির্ধারিত পথ ধরে করার উপায় নেই। মনের পরখই প্রমাণ রস বিষয়ে।

একটুখানি ইঙ্গিত রঙের রেখার সুরের কথার চলনের বলনের, অথবা অনেকখানি বিনিয়ে বলা ফলিয়ে দেখানো বিচিত্র সুর-সার রঙ-রেখা ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে—দুই পথই রয়েছে রস-রচকের সামনে। বহু-

বৈচিত্র্য-সাধনের পথ, বিরল-বৈচিত্র্য সাধনের পথ, সমস্ত শিল্পীর গতাগতি এই দুই পথ ধরে। একটুখানি দিয়ে রস-জাগানোর কৌশল, অনেকখানি দিয়ে রস-জাগানোর কৌশল, আর্ট হিসেবে দুই ক্রিয়াকেই বলা চলল ভালো। রস উদ্রেকের উপকরণের স্বল্পতা কিম্বা বহুলতা নিয়ে কথা নয়, রস হল কিনা সেই প্রশ্ন! কি কাব্যকলায়, কি নাট্যকলায়, কি চিত্রকলায় কি স্থাপত্যে ভাস্কর্যে এই দুই উপায়ই অবলম্বন করেছেন শিল্পীরা এবং প্রকৃতির মধ্যেও এই দুই নিয়ম কাজ করছে দেখি নানা ঋতুতে নানা-ভাবে। বর্ষা-ঘনাচ্ছন্ন আকাশ বর্ণবৈচিত্র্যহীন, তার উপরে একটুখানি চাঁদের আলোর ইঙ্গিত বা বিদ্যুল্লেখা বিরল-বৈচিত্র্য ক্রিয়া উপদেশ করলে। তেপান্তরের মাঠ তার মধ্যে একটি গাছ সেও ঐ কথা বললে। অবর্ণনীয়কে ইঙ্গিতে জানালেন ঋষিরা—'বৃক্ষইব স্তব্ধোঽধিতিষ্ঠত্যেকঃ'—মহাশূন্যের মাঝে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ একা তিনি! এই ধরনের বিরল-বৈচিত্র্য সম্পাদন ভারতের বুদ্ধমূর্তিতে, মিশরের পিরামিডের ভাস্কর্যে এবং চীন-জাপানের এক ধরনের শিল্পে দৃষ্ট হয়। নিঃসঙ্গতা, নিস্তব্ধতা এবং শুদ্ধতা, এই হল এ-ভাবের রচনার মূলমন্ত্র। বাস্তুশিল্পে ভারতবর্ষে এ-ধরনের বিরল-বৈচিত্র্য-সাধনের নমুনা একমাত্র দিল্লীর মোগল বাদশাহদের অন্তঃপুরে মোতিমসজিদে লক্ষ্য করা যায়। সেখানে কোনো কিছুর বাহুল্য নেই—নিষ্কলুষ শুভ্রতার একটুখানি আভাস, বিরাট দুর্গ-প্রাকারের রক্তচ্ছটার মাঝে শ্বেতচন্দনের একটি ফোঁটা। তারপর বিরল-বৈচিত্র্য আর বহু-বৈচিত্র্য ক্রিয়া মিলেছে তাজবিবির রৌজাটি নির্মাণের বেলায়। অবিচিত্র শ্বেত পাষাণকে বিচিত্রতার ঘেরে বাঁধা হল স্বপ্নরাজ্যের লতা-পাতা ফুল-ফলের সজ্জা দিয়ে—শুধু এক প্রেমিকের একটুখানি বিরহের রসে সিক্ত করে। এর সঙ্গে বহুল পরিমাণে বিচিত্র দাক্ষিণাত্যের মন্দির-মঠ ইত্যাদি ইত্যাদি এরাও আর এক পথে রচিত হয়ে ভারত-শিল্পের আদর্শ হয়ে রইল। কিন্তু আজকের দিনের বহু ইট-কাঠ লোহা-লক্কড়ের বৈচিত্র্য দিয়ে গড়া শহরের বড় ইমারত সমস্ত এবং অবিচিত্র প্রাচীরে ঘেরা গঙ্গাতীরে কারখানা-বাড়ি সমস্ত বিরল-বৈচিত্র্য বহু-বৈচিত্র্যের রাস্তা ধরেও রসের উদ্রেক করতে অক্ষম হয়ে প্রতীক্ষা করছে কবে শিল্পীর পরশ পেয়ে ধন্য হয় সেই আশায়। মোগল-শিল্পে অতি-বিচিত্রতার নমুনা হল বেগমদের স্নানাগার বা শিষমহলটি। সেখানে রঙ-রেখা কুলকিনারাহারা বিচিত্রতার ঢেউ তুলে দিয়েছে। আর আমাদের আজকের শহরের যে-কোনো স্নানঘাট খুব এক-

জন আধুনিক শিল্প-রসিকের ছাড়পত্রের অপেক্ষা করছে তো করছেই!

সাহিত্য-জগতে কাদম্বরী রচয়িতা বহু-বৈচিত্র্য-সাধনে সিদ্ধহস্ত। বৈদিক ঋষিরা কোনো-কোনো ঋকে বিরল-বৈচিত্র্য-সাধনের পথ ধরেছেন। এই দুই সাধনার সার্থকতা হল রসকে পেয়ে, না হলে কিছুই হল না, রূপ মুক্তি পেলে না রসের মধ্যে। ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে করা গেল কিন্তু যতক্ষণ না রসের জননী হল রচনা—ক্রিয়া রইল বন্ধ্যা!

নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ধরে নানা দেশে নানা কালে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন গঠন বিভিন্ন বর্ণের বিবিধ ছন্দে রচা কত কী শিল্পে প্রকাশ হল, কিন্তু সেই বহুধাবিভক্ত শিল্প রসের দিক দিয়ে দেশ-কাল নির্বিশেষে এক বলে প্রমাণিত হল রসিকদের কাছে, সেখানে ভারতীয় কি অভারতীয়, প্রাচ্য কি প্রতীচ্য, আর্য কি অনার্য—এরূপ জাতি বিভেদ করে শিল্পকে দেখার প্রয়োজনই হল না। এটি দেব-শিল্প, ওটি মানব-শিল্প, এটি গেঁয়ো শিল্প, ওটি নাগরিক শিল্প এমন বিভেদও করা চলল না। রসের দিক থেকে অনুপ্রাণিত হল যে রচনা তাই হল আর্ট, রসের অবর্তমানে রচনাটি হল কষ বা নো আর্ট।

চমৎকার গঠনের পাত্রে চমৎকারী রস ধরা হল, এ একটা রীতি রস-পরিবেশনের। সুডৌল পদ্মকলি অন্তরে ধরা পদ্মমধুর ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর একটা রস পরিবেশনের রীতি হল বাইরে চমৎকারী নয় পাত্রটিতে মনোহারী রস হল ধরা, যেমন ইক্ষু কিম্বা হরিতকীর মধ্যে রস রইল গূঢ়ভাবে! এক কথায় অন্তর্নিহিত রসের মর্যাদাতেই রস-পাত্রটির মর্যাদা। কেবল রূপ-সুন্দর যার রসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এমন রচনাকে আর্টের কোঠায় ফেলা গেল না। কিন্তু রূপ-সুন্দর নয় ভাব-সুন্দর এমন রস-রচনা তাকে ফেলনা বলে হেলা করা চলল না!

দপ্তরীর রুল-করা লাইন বার হল রূপ-সুন্দর বস্তু। চমৎকার সোজা। আর্টিস্ট ভূদৃশ্যে দিগন্ত-রেখাটি টানলেন ভাব-সুন্দর রেখা। কলে-টানা রেখার বাঁধনে রইল না রস, তুলিতে-টানা রেখার ফাঁদে রস ধরা পড়ল।

'চশমাখানা পুকুর-জলে পড়ে গেল' আর 'রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল,' 'চাবির গোছাটা কচুবনে হারিয়ে গেল' আর 'যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।' দপ্তরীর টানা লাইন আর আর্টিস্টের টানা লাইনের পার্থক্য কোথায় পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে উপরের কথাগুলো, শুধু গদ্য-পদ্যের ভেদ বোঝাচ্ছে না।

যেখানে রসের স্বাদ নেই সেখানে রূপ থাকলেও সে রূপটি গ্রাহ্য হয় না রসিকের কাছে, এই নিয়ম দেখা যাচ্ছে রস-রচনার উপভোগের।

দেহতত্ত্বের কবিতা অনেক পাওয়া যায় যা কাব্যরস দেয় না অথচ দেহ-তত্ত্বের নিকষে কষা খাঁটি বস্তু—যাকে নাম দেওয়া যেতে পারে প্রো-এ্যানাটমিক্যাল আর্ট, যথা :

কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি
তার মধ্যে (দেহটার মধ্যে ?) ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি।
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল
তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল।
নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি। (চণ্ডীদাস)

রসতত্ত্ব দিয়ে এ-রসের বস্তুর পরিমাপ করা চলে না, তান্ত্রিক দেহ-তত্ত্বের আর্ট হিসেবে এটি মহামূল্য এ বলে শিল্পশালায় সংগ্রহ করে নিচে এর লিখে দেওয়া চলে :

'সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন—চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন।'

এ ধরনের চিত্র প্রাচীন ভারতে তান্ত্রিক ক্রিয়া-কাণ্ডের যুগে নানা তান্ত্রিক পুস্তকে ধর্মপুস্তকে স্থান পেয়েছে। কারিগরি যথেষ্ট আছে সেসব তান্ত্রিক ছবির, মনে কিন্তু এ সত্ত্বেও রস-পরতন্ত্রতা গুণ বর্তায়নি তাদের মধ্যে। রসালোচনার বাইরে খালি কারিগরির নমুনা স্বরূপে ধরা রইল সেসব রচনা।

জোর করে কিছু রচনা করা অনিচ্ছাসত্ত্বে, আর ইচ্ছাসুখে ক্রিয়া করে চলা হল রচনার বেলায়, এতে করে রচনার মধ্যে ইতর বিশেষ ঘটায়, এই দুই অবস্থার ছাপও থেকে যায় শিল্প-রচনাতে।

প্রবৃত্তির বশ মানুষ, প্রবৃত্তির বশেই চলেছে মানুষের মন নানা বৃত্তি বেছে নিতে! ছবি আঁকার প্রবৃত্তি চিত্রকরের চিত্তবৃত্তিকে প্রথমে চালালে চিত্রকর্মের দিকে। কর্ম-প্রবৃত্তি জন্মাল তো চিত্র-ক্রিয়াতে পাকা হয়ে উঠল মানুষটি। তেমনি পড়াশুনার প্রবৃত্তি পাণ্ডিত্যের দিকে, ঔদরিক প্রবৃত্তি ক্ষুন্নিবৃত্তি শুধু নয়, আকণ্ঠ ফলারের ব্যবস্থার দিকে, অর্থসংস্থানের প্রবৃত্তি শুধু অন্নসংস্থান নয়, মহাজনী থেকে আরম্ভ করে ক্রোড়পতি নরপতি হবার দিকে ঠেলে নিয়ে চলল মানুষের সকল অধ্যবসায়কে! এতে করে দেখি সমান প্রবৃত্তি সমান বৃত্তি ধরার দিকে চালায় মানুষকে এবং সমপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে এক-এক দল মানুষ সমব্যবসায়ী হয়ে ওঠে আর করে চলে এক-এক শিল্পকলার সাধন। কবির দল, যাত্রার দল, সাহিত্যিকের দল, ভিন্ন-ভিন্ন কারিগরের দল, নানা দলের নানা পেশা, নানা কর্মে নিযুক্ত করালে মানুষকে—কলম পেষা থেকে জাঁতা পেষা পর্যন্ত! প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতে কর্ম করার ইচ্ছার লোপ হল, বেঁচে মরে রইল মানুষ জড়ত্বের কবলে ধরা। আহারে প্রবৃত্তি গেল উপবাসে রইল মানুষ। বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি গেল চুকিয়ে দিলে সব কাজ দড়ি-কলসির সাহায্যে লোকটি!

রসপ্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ রস-রচনায় অগ্রসর হয়—সেই প্রবৃত্তি কারো আসে নিজের অন্তর থেকে, কারো বা আসে রসিকের সঙ্গলাভে, কিম্বা রস-রচনা শ্রবণ দর্শন মননাদিতে রসপ্রবৃত্তি জাগে। ফুটবল খেলা দেখার উৎসাহ থেকে নিজেই ফুটবল খেলোয়াড় হয়ে ওঠে ছেলে। নাচ দেখতে-দেখতে নাচতে শুরু করে, গান শুনতে-শুনতে গাইতে লেগে যায়, অভিনয় দেখতে-দেখতে থিয়েটারের দলে ঢুকে পড়ে কত লোক।

কাজে প্রবৃত্তি নেই অথচ যখন কাজ করতে হচ্ছে শিল্পীকে, তখন দেখা যায় শিল্পকার্য অবনতি পাচ্ছে, কলে-ছাঁটা কষ্টকল্পিত ভাব দেখা

দিচ্ছে রচনাতে। 'ছ' অক্ষরের কবিতার ভাষা এর উদাহরণ : 'ছার রিপু ছলেতে নাশ গো শিবা, ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেহ কর মাগো কিবা! ছলছল চক্ষু ছাতি ফাটে গো বন্ধনে, ছটফট করে প্রাণ ছাড়িবে কেমনে!'

রসের প্রবৃত্তি কিম্বা অপর কিছুর প্রবৃত্তি নিয়ে কাজ হল কিনা শিল্প-রচনার পরখের বেলায় একথা ওঠে। ছন্দে বাঁধা কথার সাহায্যে কাব্যরস বাহিত হয় মনে এ আমরা জানি; আবার এও জানি, ছন্দে বাঁধা কথামাত্রেই কবিতা হয় না, রসও দেয় না, যেমন : 'দেখ বাবা কালো পাখি বসে ওই গাছে, রূপে কালো কিন্তু ওর গুণ ভালো আছে।' ছন্দ এবং কথা যোজনা কবিতার ভান দিলে কিন্তু নৈতিক প্রবৃত্তির প্রেরণা তাতেও ঢাকা পড়ল না। এইবারে রসের প্রবৃত্তি বশে দুই ছত্র মেয়েলী ছড়া পাখির উপর বলা হল কেমন তা দেখি—'আয় রে পাখি আয় কালো জামা গায়, আসতে যেতে ঘুঙুর বাজে আমার যাদুর পায়।' রূপবান কোকিল আর গুণবান কোকিল কোনটা রাখি কোনটা ছাড়ি? চাণক্য ছিলেন নীতিশাস্ত্রবিদ, নৈতিক প্রবৃত্তি নিয়ে চাণক্য নীতিমালা লিখলেন, কিন্তু বিষ্ণুশর্মা রসবেত্তা, শিশুচরিত্রদ্রষ্টা, চমৎকার কৌশলে হিতোপদেশ দিলেন পঞ্চতন্ত্রের পাঁচ সুরে মিলিয়ে।

রসবুদ্ধির দ্বারায় সুনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি সুন্দর রচনায় প্রবৃত্ত করায় শিল্পীকে, এর উদাহরণ স্বরূপ এ দুটি রচনা ধরতে পারি : 'ভালো মালা গাঁথে মালিয়া রে, বনমালি মেঘমালি কালিয়া রে' (ভারতচন্দ্র), 'দোলে রে মাল চন্দনী গোপাল' (ছেলে ভুলানো ছড়া)।

নিজের প্রবৃত্তি ও রসবুদ্ধি দ্বারায় প্রণোদিত হয়ে স্বাধীন ভাবে রচনা করে চলার সুযোগ আদিমতম মানুষের ছিল। যাকে আর্টে প্রিমিটিভিজ্‌ম্‌ বলে তারও মূলে রয়েছে নিছক প্রবৃত্তি নয়, বুদ্ধির দ্বারা এবং রসবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি। কেননা দেখি মানুষের আদিমতম শিল্প-সামগ্রীর মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত পাগলের খেয়ালে গড়া কিছুই নেই। তাদের শিল্পবুদ্ধি কাজের উপযুক্ত অথচ সুন্দর গঠনের বস্তু সমস্ত দিয়েছে। সুন্দর বাঁকের ধনুক তাদের হাতে রঙ-রেখার কত কারুকার্য পেয়ে সুন্দর কাজের জিনিস হয়ে উঠল নানা অস্ত্রশস্ত্র প্রহরণ, সেই আদিকালে রঙ-রেখার উচ্ছৃংখলতা মোটেই নেই, সেখানে গঠনের বৈচিত্র্য আছে কিন্তু সেখানেও শোভার বৈলক্ষণ্য কোথাও নেই। অবাধ প্রবৃত্তির বশে যা-তা করাতে রসসৃষ্টির ও রূপসৃষ্টির ব্যাঘাত

জন্মায়। ওরূপ ভাবে ক্রিয়া করে চলা একমাত্র শিশুকে এবং অবোধ মনুষ্যকে মানায়। রঙের অপচয়, রেখার বৈলক্ষণ্য, সুরের মধ্যে হঠাৎ বেসুর যেমন তেমনি, কিম্বা রসালাপের মধ্যে উন্মত্তের প্রলাপের মতো বিস্ময় উৎপাদন করেই ক্ষান্ত হয়।

ইউরোপে বাদ্যবাদন শিল্পে এই ভাবের সুর-বেসুরের রঙ-বেরঙের উন্মাদন এবং ছাঁদ-ভাঙা রূপের বাঁধ দিয়ে রসোদ্রেকের চেষ্টা কেবল সার্থক হয়েছে যেখানে মানুষের রসবোধ ছন্দবোধ ইত্যাদি সুনিয়ন্ত্রিত করেছে রচয়িতার উৎকট প্রবৃত্তির প্রেরণা। রঙের অবাধ-প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে দেখা দিলে দোলের দিনে মানুষগুলোর সর্ব অঙ্গে। রঙরেজের দোকানে সেই রঙের প্রবৃত্তি সুনিয়মে চলে সুন্দর রাঙালে লাল-নীল শাড়ি যা দেখে কবির রস জাগল—'চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিতে মোর!'

অনিয়ন্ত্রিত বাতাস ঝড়ের দিনে সন্ধ্যাকাশে উত্তাল রঙের ঢেউ তুললে কিন্তু ছন্দ-ছাড়া রঙ নয়—বর্ণশিখার অবর্ণনীয় বৃহৎ ছন্দে রচা ছবি!

মানব-শিল্পের ইতিহাস থেকে দেখা যায় শিল্পক্রিয়ার প্রারম্ভে রঙ দেবার রেখা টানবার প্রবল প্রবৃত্তির ছাপ আদিযুগের শিল্প-রচনা সমস্তে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে জোরালো রঙ জোরালো রেখার টান-টোনে। এই ভাবের কাজের উদাহরণ স্বরূপে ধরা যেতে পারে মেলাতে এখনো যেসব মুখোট এবং কাগজের ও মাটির রঙালো খেলনা আসে সেগুলোতে, বৃষকাঠ, কালীঘাটের কাঠের পুতুল, কাঠের কৌটোগুলোতে এই আদি-কালের কাজের ধারার লক্ষণ দেখি আমরা। নানা রঙের পোঁচ, নানা রেখার ঘোর-প্যাঁচ, মিশ্র রঙ কিম্বা ভাঙা বা কর্তিত রেখা নেই বললেই চলে এই ধরনের শিল্পরচনায়।

ছেলে-ভুলানো-ছড়াগুলি কত কালের কে জানে, সেসব রচনাতে আদিম শিল্পের রেখাক্ষরীণ রূপটি স্পষ্ট ধরা গেছে—'এক যে গাছ ছিল—লতায় লতিয়ে গেল। তার এক কুঁড়ি হল, ফুল-ফুল-ফুল ফুটে গেল।' ফুলকারি কাঁথা, সুজনী এসবের মধ্যেও এই রেখা দেবার আদিম প্রবৃত্তির ক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছে। রঙ দেবার হিসেব এই ভাবে তারও উদাহরণ যেমন কাঠের কৌটায়, মাটির পুতুলে, তেমনি ছড়ার মধ্যেও রয়েছে—'এ পারেতে কালো রঙ বিষ্টি পড়ে ঝমঝম, ও পারেতে লঙ্কা-গাছটি রাঙা টুকটুক করে'—ঘন কালো ঘোর লাল কিম্বা যেমন 'রঙ

নয় তো কাঁচা সোনা!' এক বর্ণের পরে আর এক বর্ণের পালিশ দেখি অনেক সময়ে কিন্তু এক বর্ণের সঙ্গে আর এক বর্ণের মিশ্রণ দেখিনে— 'কে বলে রে কালো, পাটনা থেকে হলুদ এনে গা করেছি আলো!' এক রঙের পাশে আর এক রঙ কাপড়ের পাড়ে ডুরে শাড়িতে লক্ষ্য করি। নৌকোর গলুই এই ভাবে এখনো খোদাই করা ও রাঙানো হয়। বৌদ্ধ-যুগে তোরণের উপরে মকর-মুখগুলো এবং মন্দিরের গায়ে নানা মুখোট, এমন কি পুতুলগুলোতেও এই ভাবে রঙ-রেখার ক্রিয়া রয়েছে দেখা যায়। অন্তর্ভারত বহির্ভারত দুই স্থানেই এই ভাবের আদিমতম শিল্প-প্রবৃত্তি নিয়ে এখনো কাজ করে চলেছেন শিল্পীরা—শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে মন্দির-মঠ, নৌকোর গলুই ইত্যাদি এই আদি প্রবৃত্তির ছাপ ধরে রয়েছে এখনো। আমাদের দুর্গাঠাকরুণের ডাকের সাজ এই ভাবে রঙ-রেখার প্রাবল্য দিয়ে রচা হচ্ছে, ভালো-ভালো শতরঞ্চ এবং শতরঞ্চ-খেলার ছক, তাও এই আদিমতার সাক্ষ্য দেয়।

রঙের দিকে রেখার দিকে শিল্পীর সহজ ও প্রবল প্রবৃত্তি, এরই উপর পত্তন হল মানব-শিল্পের, দেশ-কাল-নির্বিশেষে। মানব-শিল্পের উষাকালের এই রঙ-রেখার উৎসব, সে ক্রমে ধারা ধরে যখন এগুলো তখন শুধু বর্ণের জন্যেই বর্ণ, রেখার জন্যেই রেখা নয়—রসের প্রকাশের জন্যে তারা—রঙ তখন রঙে মিলে নতুন বর্ণের সৃষ্টি করছে, রসের ধর্ম শিল্প-কর্মের সঙ্গে মিলেছে, শিল্পীর অন্তর-বাহির এক রূপ-রঙের ক্রিয়ায় মিলেছে, গানের সুরের সঙ্গে শাল বোনা চলেছে তাঁতশালে। বাইরের কারুকার্য অন্তরের রসের দেবতার বন্দনা ঘোষণা করে চলেছে শিল্পের মধ্যাহ্নকালে। মানব-জীবনের ঘাটে-ঘাটে ঢেউ দিয়ে চলেছে মানবের কৈশোর ও যৌবনের শিল্প। রাজার বিলাসভবনে দেখা দিল সে, দেবতার মন্দিরে পৌঁছল সে দেবদাসীর নৃত্যকলার ছদ্মবেশে, এক-এক ঘাটে এক-এক ভাবের ও রসের তরঙ্গ ওঠানো শিল্প-ক্রিয়া। কোনার্ক মন্দির, তাজমহল, এমনি আরো দু-চারটে মূর্তি যেমন সিংহলের 'কপিল' মূর্তি, মান্দ্রাজের 'নটরাজ' মূর্তি, কাংড়া ও মোগল চিত্র এবং অজন্তার ভিত্তি-চিত্র, এরা সব ভারত-শিল্পের কৈশোর ও যৌবনের সাক্ষ্য স্বরূপে রয়েছে বর্তমান।

মানুষের বয়েসের যেমন পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয় না তেমনি শিল্পের ক্রিয়া যে-সময়ে একটা সপ্তম আশ্চর্য সৃষ্টি করলে তার পুনরাবৃত্তি হবে

না আর, হয়তো হবে অষ্টম আশ্চর্য প্রকাশ, এর মধ্যে বহু যুগ কাটবে। এই ভাবে এগিয়েছে সব দেশের শিল্প, শৈশবে প্রবল প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়ার ছাপ ধরেছে শিল্প, কৈশোরে জোয়ার-ভাটার ছন্দ ধরে রঙ-রেখাদির গতাগতি ক্রিয়া চলেছে—বাইরের রঙ আসছে অন্তরের দিকে, অন্তরের রঙ যাচ্ছে বাইরের দিকে, ভাব ও রসবন্ত শিল্প। 'শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেল'—যৌবনে শিল্পের রসাভিসার, পূর্বরাগ চুকে গিয়ে মহারসের সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পের রূপমুক্তির অবস্থা, এক বিচিত্রে মিলছে, বিচিত্র মিলছে একে। মানবজাতির প্রবৃত্তির গতি ধরে যে-ভাবে শিল্পধারা দেশ-কালের মধ্যে দিয়ে বইল সেই অনুসারে শিল্পের চর্চায় পরিষ্কাররূপে শিল্পকে দেখা সহজ হয়।

কি বা সুন্দর, কোথায় বা সুন্দর, কি বা অসুন্দর, কোথায় বা অসুন্দর ইতি মহান বিতর্ক!

মহাপণ্ডিত তাঁরা জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে বহু সন্ধান ও সৌন্দর্য-তত্ত্বের তর্ক-বিতর্কের পর স্থির করে বললেন—'সত্য সুন্দর মঙ্গল' তিনে এক, একে তিন, তিনিই সুন্দর। যেমন ঐ রসের বেলায় বলা হল 'রসো বৈ সঃ' সেই যে গো তিনিই রস! 'পণ্ডিতে-পণ্ডিতে যুদ্ধ সমস্যা পুরিয়া।' গ্রীস দেশের একদল কারিগর তিলোত্তমা নির্মাণের পন্থা ধরে বিধাতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে নানা সুন্দরীর টুকরো-টুকরো সৌন্দর্য নিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দরী মূর্তি গড়েছিল। আমাদের দেশেও এর দৃষ্টান্ত বিরল নয়, চন্দ্রবদনা, পদ্মলোচনা, উৎপলবর্ণা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, তন্বী শ্যামা, কত কী দিয়ে রতি ও কন্দর্প গড়ার প্রকাণ্ড চেষ্টা হয়ে চুকেছে, কিন্তু সুন্দর-অসুন্দরের স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র হিসেব আর্টিস্টের কাছে এবং জন-সাধারণের কাছে রয়েছে ধরা।

আর্টিস্টদের কেউ-কেউ বলছেন 'সুন্দরের সন্ধানী' কথাটা এক হিসেবে ঠিক, এক হিসেবে ঠিক নয়। আলকাতরার মধ্যে থেকে চমৎকার রঙ ও অতি সুমিষ্ট রস এবং সুরভি পদার্থ যে বৈজ্ঞানিক বার করলেন তিনি সুন্দরের সন্ধানী ও আর্টিস্ট, এ কথা বলা চলল কেননা জ্ঞানের দ্বারা সন্ধান করে তবে পাওয়া গেল এসব বস্তু। আলকাতরার মধ্যে থেকে পদার্থ-বিজ্ঞানের একটা সত্য, সেই সঙ্গে কতকগুলি সুন্দর বস্তু আবিষ্কৃত হল, অতএব এ ভাবের ক্রিয়া ধরে কারুশিল্পে অনেক আবিষ্কৃত সুন্দরের দেখা পাওয়া গেল।

আর একরূপ সুন্দর যাকে বলা যায় আবির্ভূত সুন্দর, সেখানে জ্ঞান-প্রদীপের সাহায্য নেওয়ার দরকারই হয় না—স্বতঃপ্রকাশিত সুন্দরকে তার নিজের প্রভাতেই চিনে নেওয়া যায়। বিশ্বপ্রকৃতির যা কিছু বড়, যা কিছু ছোট, অথচ গভীর ভাব ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ, তা এই আবির্ভূত হওয়ার পথে এসে পেঁছায়, কোনো সন্ধান বা সন্ধানীর অপেক্ষা না

রেখেই। কবি কালিদাসের ঋতুসংহারের বর্ষা বর্ণনাটি এই আবির্ভূত সুন্দরের দৃষ্টান্ত বলে ধরা চলে—'সশীকরাম্ভোধর মত্ত কুঞ্জরস্তড়িৎ পতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতির্ঘনাগমঃ কামিজন-প্রিয়ঃ প্রিয়ে,' ধুমধামে হঠাৎ আবির্ভাব সুন্দরের! শরৎ বর্ণন, সেখানে দেখলেন কবি আর এক সুন্দরের আবির্ভাব—'কাশাংশুকা বিকচপদ্ম-মনোজ্ঞবক্ত্রা সোন্মাদ-হংস-রব-নূপুর-নাদরম্যা, অপক্কশালির-চিরা তনু-গাত্রযষ্টিপ্রাপ্তা শরন্নববধূরির রম্যা,' নববধূর আবির্ভাবের মতো রমণীয় আবির্ভাব সুন্দরের। আবার সকালের শিউলিফুলের যেন একটু করুণ আবির্ভাব হেমন্তের দিনটির—'নবপ্রবালোদ্‌গমশস্যরম্যা প্রফুল্ললোধ্র পরিপক্কশালিঃ বিলীনপদ্মঃ প্রপতুষারো হেমন্ত কালঃ সমুপাগতঃপ্রিয়ে!' এইবারে কবির কাছে যা সুন্দর অথচ আমার কাছে যা সুন্দর নয়, এমন দু-একটা উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। বর্তমান কোনো আর্টিস্ট বা কবির লেখা তোলায় বিপদ আছে, তাই কালিদাস থেকেই তুলি দৃষ্টান্ত—কুমারসম্ভব কাব্যে পার্বতীর রূপবর্ণনের সময় শিল্পশাস্ত্র ও রসশাস্ত্র-কারদের মতে যেগুলো সুন্দর বলে ধার্য হয়ে ছিল তার অনেকগুলিই অকেজো বলে বাদ দিলাম—'নগেন্দ্র হস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বা দেকান্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষাঃ লব্ধঽপি লোকে পরিণাহিরূপং, জাতাস্ত্ব দুর্ব্বোরুপমান বাহ্যাঃ।' আমাদের ভারতচন্দ্রও কম যান না—'কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা, পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।' কালিদাস ও ভারতচন্দ্র যদি চিত্রকর কি পুরোপুরি মূর্তিকারও হতেন তবে কথা ছিল না, দেখিয়ে দিতে পারতাম তাঁদের মানস-সুন্দরীকে শুধু কথার বর্ণনায় যেটুকু ধরেছি—'তন্বী শ্যামাশিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, মধ্যক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ন নাভি, শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রাস্ত-নাভ্যাং যা তত্র স্যাদ্‌ যুবতীবিষয়ে সৃষ্টিবাদ্যেব ধাতুঃ!' ঘুরে-ফিরে সেই অজন্তার ছবি নয় মান্দ্রাজী স্ট্যাচু! সেকেলে গুরু-নিতম্বা বিম্বাধরা ইত্যাদি। ভারতচন্দ্রেরও সেই একই কথা—'শারদ পার্বণ শীধুধরানন পঙ্কজকাননমোদিনী! কুঞ্জরগামিনী কুঞ্জবিলাসিনী লোচন-খঞ্জনগঞ্জিনী! কোকিলনাদিনী গীঃ পরিবাদিনী স্ত্রীপরিবাদবিধায়িনী—ভারত মানস মানস সারস রাস বিনোদ বিনোদিনী।'

ব্যক্তিগত রুচি ও অরুচির উপরে সুন্দর-অসুন্দরের যখন বিচার নির্ভর করছে তখন সুন্দর-অসুন্দরের পরিষ্কার ভেদাভেদ নির্ণয় করে

দেওয়া কঠিন। যেমন কালিদাস ও ভারতচন্দ্রের উপরের কটা বর্ণনা সুন্দরকে পরিষ্কার ভাবে ধরতে পারলে না, তেমনি সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের তর্কের পথেও পৌঁছে দিতে অক্ষম হল আদর্শ-সুন্দরকে! নিছক সত্য সুন্দর নয়, যেমন—'নরাগজাবিশেশয়, তার অর্ধেক বাঁচে হয়। বাইশ বলদা তেরো ছাগলা; তার অর্ধবরা পাগলা,' আবার 'দ্বাদশ অঙ্গুলি কাঠি, সূর্যমণ্ডলে দিয়া দিঠি; রবি কুড়ি সোমে ষোলো, পঞ্চদশ মঙ্গল ভালো। বুধ বৃহস্পতি এগারো বারো, শুক্র শনি চৌদ্দ তেরো; হাঁচি জেঠি পড়ে যবে অষ্টগুণ লভ্য হবে।' অমঙ্গলের গন্ধমাত্র নেই, পূর্ণ লভ্য পূর্ণ মঙ্গল কিন্তু সুন্দরের দেখা পাচ্ছি কোথায়? বলতে পার তিনে মিলে তবে সুন্দর! ভালো একটা সুন্দর খনার বচনই শোনাই—'ডাকয়ে পক্ষী না ছাড়ে বাসা, উড়িয়া বসে খাবে করি আশা। ফিরে যায় নিজালয়ে না পায় দিশা, খনা ডেকে বলে সেই সে উষা।' এখানে তিনে এক হয়ে মিলল না অথচ অবর্ণনীয় কিছুর স্পর্শ পেয়ে সুন্দর একটু সত্য ছবি হয়ে উঠল উষার এই কয় ছত্র। এর সঙ্গে আমাদের শিশুপাঠের উষা-বর্ণন মেলাই দেখ—'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল' ইত্যাদি-ইত্যাদি মাঠ থেকে পাঠশালা পর্যন্ত সত্য বর্ণনা! শিশুমঙ্গলের জন্যে পরিষ্কার আয়োজন : 'মাতার সমান নাই শরীর পোষিকা, ভার্যার সমান নাই শরীর তোষিকা, বিদ্যার সমান নাই শরীর ভূষিকা, চিন্তার সমান নাই শরীর শোষিকা'—চিন্তার শোষিকা শক্তিতে কাব্যশরীর শুকিয়ে নিছক সত্যের খানিক ভুসি মাত্র সৃষ্টি করলে!

সুন্দর সম্বন্ধে চলতিভাষায় বেশ একটু ইঙ্গিত রয়েছে—'কামালে-জোমালে বর, নিকোলে-জুকোলে ঘর,' সুমার্জিত সুপরিষ্কৃত হল তো সুন্দর দেখাল। আর একটা কথা ভারি চমৎকার—'বাঁকায়-বাঁকায় ভালো মিলে গেছে...' জলের রেখা নদীতট বাঁকে-বাঁকে মিলে সুন্দর—মিলের দ্বারায় পাই সুন্দরকে। যাকে বলে রঙের হারমনি তা অন্যভাবে সম্পাদিত হয়, সবল দুর্বল মসৃণ কর্কশ ইত্যাদি রঙের একত্র বন্ধনে, যেমন বিবাদী সমবাদী সুরের মিলনে হল রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি।

এমনি কতকগুলো সহজ উপায় ধরে মানব-শিল্প প্রকাশ করতে চলল সুন্দরকে। কিন্তু দেখি পঙ্কের কাজ ও চুন-বালি-খসা ভাঙা মন্দির ঘাট আধখানা গঙ্গার কাদায় ডোবা, বাকিটা চোরকাঁটা কুশ-কাশ নানা

আবর্জনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর একটি মনভোলানো দৃশ্য তথা-কথিত অসুন্দরের সমাবেশে সৃষ্টি হল যার। নদীর ধারে কল-কারখানা, গাঁয়ের পার্বলিক লাইব্রেরীগুলো এই ভাবে কালের স্পর্শ পেয়ে ছন্নছাড়া রকমে সুন্দর হয়ে ওঠার অপেক্ষা করছে না যে তা কে বলে!

কতক শিল্প-সামগ্রীর সুন্দরতা পুরোনো হয়ে কালের কালিমা পেয়ে বাড়ে, যেমন তাজমহলের পাথরের প্রখর শ্বেতবর্ণ কালের স্পর্শে পুরাতন গজদন্তের লালিত্য পেয়ে শোভা ধরলে। কতকগুলো জিনিস, যেমন ঝকঝকে কিংখাব মখমল ইত্যাদি, কালবশে বর্ণের স্নিগ্ধতা পেয়ে সুন্দর হয়ে উঠল। তেমনি আবার দেখি কতকগুলো জিনিস কালবশে অনেক-খানি ডৌল ফিরিয়ে চেহারার অদল-বদল করে নিয়ে তবে হল সুন্দর— যেমন ভাঙা চাঁদ, ভাঙা মন্দির, ভাঙা ঘাট, পুরোনো নৌকো, বুড়ো গাছ, বুড়ো মানুষ ইত্যাদি-ইত্যাদি। কিন্তু একটা ভাঙা হাড় কিম্বা জ্যান্ত মানুষের কাটা হাত কোনো কালেই সুন্দর হতে পারল না! আর্টের মজা এই যে পাথরের একটা মূর্তির হাত ভেঙে যাক তবু মূর্তিটা লাগবে সুন্দর, ভাঙা হাতখানাও ঠেকবে সুন্দর, কারিগরের গড়া পুতুল তিল-তিল সৌন্দর্যের বাসা। জীবের সৌন্দর্য এ ধরনের নয়, তার এক অংশ থেকে আর এক অংশ বিচ্ছিন্ন করে দেখতে গেলে অসুন্দর ঠেকবেই, এই হল তফাত প্রাকৃতিক শিল্পসৃষ্টি আর মানবিক শিল্পসৃষ্টিতে। এক থান কিংখাব কাপড়ই দেখি কি তারই এক গজ টুকরো দেখি বাধা হয় না কাপড়খানার সৌন্দর্য বুঝতে, কিন্তু শুধু এক গোছা চামর কেশ কেশবতী কন্যার না রূপ না ভাব কোনো কিছুই জানায় না যদি না পূর্ব-দৃষ্ট কেশবতীর স্মৃতি বা স্মারক ফোটোগ্রাফখানি কাছে থাকে।

তবেই দেখা যাচ্ছে কালের ছাপ পেয়ে কতক শিল্পদ্রব্য হয়ে উঠেছে সুন্দর, কতক প্রমাণ করছে স্বতঃসুন্দরতা নিজের। কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কতক শিল্প-সামগ্রী সুন্দর বলে চলল কতক রয়ে গেল অসুন্দরের কোঠায় কালের প্রতীক্ষা করে।

সুশ্রী-বিশ্রী সুন্দর-অসুন্দর এমনি কতকগুলো কথা দিয়ে বোঝাই, প্রত্যেকে নিজের ভালো লাগা কি না লাগার হিসেব। আসলে সুন্দর এই, অসুন্দর এই, এমনি দুটো আদর্শ, সুশ্রী কি বিশ্রী কোথাও নেই। 'মক্ষিকাব্রণ মিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদাঃ' গোছের নৈয়ায়িকের তর্ক দিয়েও সুন্দর-অসুন্দরের যথাযথ মীমাংসা করা যায় না। ব্যক্তিগত রুচির

উপর কথা চলে না—'ওদের ছেলেটা ঠিক কেলে বাঁদরটা, মোদের ছেলেটি ঠিক কেষ্ট ঠাকুরটি,' সেখানেও রুচির কথা ওঠে রসাস্বাদের বেলায়। যদি কিছুকে সুন্দর বলা চলে শিল্পীর দিক থেকে তো সে চরিত্রবানকে; যা চরিত্রবিহীন তা অসুন্দর এও বলা চলে!

চরিত্র বিষয়ে একেবারে নিঃস্ব যা আমাদের কোনো রসের স্বাদ দিচ্ছে না—কি কটু কি মধু, আর্টের হিসেবে তাকেই বলা চলে অসুন্দর। জগতেই যখন সুন্দর-অসুন্দর বলে একটা পরিষ্কার ব্যবধান নিয়ে দুটো কিছু নেই, তখন প্রত্যেক মানুষের কাছে মনের পরখ নিয়েই সুন্দর-অসুন্দরের বিচার হতে বাধ্য এবং সেই কারণেই শিল্পীর উপর সুন্দর কি, অসুন্দর কি, তা বেছে নেবারও বাধা না থাকাই সংগত।

॥ সমাপ্ত ॥

কাকে বলে শিল্পের সার্থকতা? কাকে বলে সুন্দর? রূপনির্মাণে শিল্পীর স্বাধীনতা কত দূর গ্রাহ্য? যুগে-যুগে রীতি-নীতি প্রকার-প্রকরণের মধ্যে প্রভূত অদল-বদল সত্ত্বেও শিল্পের সৌন্দর্য কী ভাবে অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে? কালনির্বিশেষে শিল্পের ক্ষেত্রে শাস্ত্রের অনুমোদিত কোনো বিধান থাকা সম্ভব কিনা? কিংবা শিল্পের রস আস্বাদ করার অধিকার কী ভাবে আমাদের মধ্যে জন্মাতে পারে?—এ-সব নিগূঢ় তত্ত্ব নিয়ে পৃথিবীতে বাদানুবাদের অন্ত নেই। এই বাদানুবাদ প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত উৎসাহ এবং কৌতূহলেরই সাক্ষ্য। আমাদের দুর্ভাগ্য যে শিল্পশাস্ত্রের—যাকে বলে নন্দনতত্ত্ব, তার—বিষয়ে মৌলিক তেমন সংগ্রন্থ বাংলাভাষায় নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাগেশ্বরী বক্তৃতামালায় অবনীন্দ্রনাথ আমাদের এই প্রাণের অভাব পূরণ করেছিলেন। গুণীশিল্পী, রসতাত্ত্বিক এবং অসামান্য সাহিত্যস্রষ্টার মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তারই অপরূপ নিদর্শন এই বক্তৃতাবলী। 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' নামে পূর্বে যে-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল সেটি ছিল তাঁর মৌখিক ভাষণের প্রতিলিপি। 'শিল্পায়ণ' গ্রন্থে সেই সব রচনারই লেখককৃত সংশোধিত রূপ প্রথম প্রকাশিত হল।